হিরণ্যগর্ভ
দশম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
৩০শে আষাঢ়, ১৪২৪

Hiranyagarbha
Volume 10, No. 2
हिरण्यगर्भ
दशम वर्ष, द्वितीय संख्या
तारिख-१५ जुलाइ,२०१७

৩০শে আষাঢ়, ১৪২৪ 15th July, 2017

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—		
শ্রীশ্রীগণেশ	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	07
মান্ধাতা ও বিন্দুমতী	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	09
কুরুক্ষেত্র দেখে এলাম	শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত	10
গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	12
যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	13
নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা	শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর	15
শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী	বৃহৎ কিশোরী ভাগবত	16
যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	17
শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা	স্বামী সংবেদানন্দজী	18
যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায়	20
ভক্তিমতী ভানুমতীর কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	21
গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	22
নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	24
জীবনাভাস	শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়	26
রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত	শ্রীমতী বীণা চৌধুরী	28
হিন্দী বিভাগ ঃ—		
श्रीश्रीगणेश	श्रीविमलानन्द	30
गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	32
योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	33
मान्धाता और बिन्दुमती	श्रीमती ज्योति पारेख	34
योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	35
श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीविमलानन्द	37
भक्तिमती भानुमती	श्रीमती ज्योति पारेख	38
उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	39
नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला	श्रीमती सुशीला सेठिया	40
ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर	श्रीविमलानन्द	41
श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा	श्रीमती ज्योति पारेख	43
English Section ঃ—		
Sri Sri Ganesha	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	46
Biography of Manicklal Dutta	Dr. Barun Dutta	49
The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	51
My Life With Anirvan	Sri Gautam Dharmapal	52
Gems from the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	55
Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	56

ISBN No. 978-93-80373-94-2 Cover : Lord Ganesh

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhanda-mahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

গ্রীষ্মের নিদাঘশেষে বর্ষার কাজল কালো মেঘের আবরণে আকাশকটাহ সমাচ্ছন্ন । মেঘডম্বরু মাঝে ভেসে আসে পুণ্য শঙ্খধ্বনি। প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার হিল্লোলিত রথধ্বজা নির্ঘোষিত করে সনাতন ধর্মের জয়ধ্বনি — নিত্যগোলকবিহারী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পরম ঐশ্বর্য্যময়রূপ শ্রীজগন্নাথের পরম মঙ্গলময় সর্বব্যাপীতা।

গুরুপূর্ণিমার পুণ্যলগ্ন সমাগত। এই পুণ্যক্ষণে হিরণ্যগর্ভের এই সংখ্যাটি আমরা নিবেদন করেছি সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক, সর্ববিঘ্নবিনাশক, অনন্তপ্রজ্ঞাধীশ শ্রীগণেশের দিব্যচরণে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীগণেশ পার্বতীরূপী আদ্যাশক্তির পুত্র, সাক্ষাৎ নারায়ণ-স্বরূপ। দেবী পার্বতী কঠোর তপোবলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। পার্বতী ও মহাদেবের আশীর্ব্বাদে গণেশ সকল প্রমথগণের অধিপতি, সর্ববিঘ্নবিনাশক, সর্বসিদ্ধিদাতা, মহাঐশ্বর্য্যশালী ও পরম মঙ্গলময়। সৃষ্টির সর্বস্তরে তাঁর অধিষ্ঠান। অধ্যাত্মজগতে সাধকের জ্ঞান-চেতনার ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তর তাঁর কৃপাপরশে পরিপূর্ণ। আবার তিঁনিই মহাভারতের লিপিকার — মহাভারতের অন্তর্নিহিত যোগতত্ত্বকে অধ্যাত্ম-জ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ ও বর্ণন করেন।

আজ শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে এই সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক, মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন, পরম মঙ্গলময় গণেশকে আমাদের হৃদয়ের ভক্তি-বিনম্র প্রণাম নিবেদন করি। সেই সঙ্গে অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা, মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয়, পরমপূজ্য শ্রীশ্রীবাবা ও আদ্যাশক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের ভগবৎ-চরণে ভক্তিবিনম্র প্রণাম জানাই।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজগণের চরণে আমাদের বিনম্র প্রার্থনা আমরা যেন শ্রীশ্রীমায়ের প্রদর্শিত পথে, দৃঢ়-সঙ্কল্পিত চিত্তে, শুদ্ধ অন্তঃকরণে, আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে পারি — সতঃ সমর্পিত চিত্তবোধে উন্নীত হতে পারি।

।। ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।।

The skies have started to get laden with dark cumulous clouds as we leave behind the scorching sweltering days of summer. One can hear the sound of conch shells and religious chants filtering from afar. The auspicious day of Ratha Yatra of Lord Jagannath, Balaram and Subhadra draws near. The mankind bows their head in humble obeisance to Lord Jagannath, the divine manifest of Nityagolakavihari Purushottam Shri Krishna, to seek His blessings on this auspicious occasion – the flags atop His chariot fluttering proudly to emphasize the triumph of Dharma over the demonic forces!

Guru Purnima, one of the most auspicious days in spiritual calendar, is just round the corner. Along with its solemn observance in our Ashram premises, we have dedicated this issue of Hiranyagarbha to the Lotus Feet of Shri Ganesha – the Lord of boons, success, wisdom and the destroyer of all hardship.

Shri Ganesha is the divine manifestation of Shri Narayana, who graced Parvati, the Divine consort of Lord Shiva, as her son as a result of Her austere penance. By the blessings of Shiva and Parvati, Shri Ganesha is the head of all Pramathas and the Lord of boons, wealth, wisdom and welfare. Saints in pursuit of supreme knowledge can advance only by His grace. The Mahabharata was scripted in His divine hands, the divine philosophy inherent in its hymns expounded by Him for mankind. He is the Supreme Grantor of success, in all its realms.

Come …. On this auspicious day of Guru Purnima, let us bow our heads to the Lotus feet of Lord Shri Ganesha, Akhanda-Mandaleshwar Nanga Baba, Mahavatar Shri Shri Babaji Maharaj, Shri Shri Shyamacharan Lahiri Mahashay, our beloved Shri Shri Baba and Sree Sree Maa to seek their blessings in our spiritual life. We pray for their compassion to bestow us with chastity, piety and dogged devotion in our spiritual journey forward.

শ্রীশ্রীগণেশ

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

দক্ষযজ্ঞে পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে মেনকার (মেনা) গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বহু বৎসর সন্তান না হওয়ায় দেবী পার্বতী ভগবান হরি নারায়ণের প্রীত্যর্থে এক মহাপুণ্যক ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। এক বৎসর ব্রত পালন করিলে পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইলেন এবং অকস্মাৎ আকাশ মণ্ডলে দিব্যরথে আবির্ভূত হইয়া মুনি-ঋষি-দেবতাদের সমক্ষে দেবী পার্বতীকে পুত্রলাভের বর প্রদান করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ হইতে এক মহাজ্যোতি সম্পন্ন দিব্য তেজপুঞ্জ নির্গত হইয়া পার্বতীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। যাহার ফলে পরবর্তীকালে পার্বতীর এক দিব্যপ্রভা সম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পার্বতীর এই পুত্রই 'গণেশ' নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণই 'গণেশ' রূপে দেবী পার্বতীর পুত্ররূপে নিত্য মঙ্গলময় 'দেব' রূপে আবির্ভূত হন। 'গণেশ' অযোনিসম্ভবা, ব্রহ্মাণ্ডের অন্যতম এক অত্যদ্ভুত সৃষ্টি। পুরাণে কথিত আছে যে যথা সময়ে পার্বতীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পর দেবতারা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ইত্যাদি সকল স্থান হইতে নবজাত দিব্যশিশুকে দেখিবার জন্যে উপস্থিত হন। অন্যান্য দেবতার সঙ্গে শনিও আসেন। শনির স্ত্রী শনিকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে তিনি যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহারই বিনাশ সাধন হইবে। সেই শাপ স্মরণ করিয়া শনি নবজাতকের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অধোমুখে অবস্থান করিলে দেবী পার্বতী তাঁহার পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে তাঁহাকে বারংবার অনুরোধ করেন। ইহাতে শনি দেবী-পার্বতীকে তাঁহার অভিশম্পাতের কাহিনী বিবৃত করেন। সকল বিবরণ শুনিয়াও পার্বতী শনিকে তাঁহার নবজাতকের দিকে একবার দেখিতে বলেন। তখন শনি শিশুর দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্রই শিশুর মুণ্ড দেহচ্যুত হয়। এই সংবাদ ভগবান বিষ্ণুর নিকট যাওয়ামাত্রই ভগবান ইহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সেখানে আসেন। প্রথমে পথিমধ্যে একটি নিদ্রিত শ্বেত-হস্তী দেখিয়া শ্রীহরি তাঁহার সুদর্শন চক্রের সহায়তায় তাহার মস্তক কাটিয়া লইয়া আসেন এবং গণেশের গলার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেন। দেব গণেশ যাহাতে সকলের নিকট অনাদৃত না হন, সেইজন্য দেবতারা নিয়ম করেন যে সর্বপ্রথমে গণেশের পূজা না হইলে তাঁহারা কেহই কোনও পূজা গ্রহণ করিবেন না। এই কারণে প্রত্যেক দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে প্রথমে শ্রীগণেশ পূজিত হন।

বিবিধ পুরাণে 'গণেশ' সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার ঘটনা আছে। যেমন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে গণেশের একটি দাঁত সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান আছে যে পরশুরাম ত্রিসপ্তবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কৈলাসে আসেন। তখন শিব ও পার্বতী অন্তঃপুরে নিদ্রিত ছিলেন আর গণেশ দ্বাররক্ষক হইয়া পরশুরামকে ভিতরে প্রবেশ করিতে বাধা দেন, যারফলে গণেশ ও পরশুরামের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া যায়। এই যুদ্ধে পরশুরামের কুঠারাঘাতে গণেশের একটি দাঁত সমূলে উৎপাটিত হয়, তাই গণেশকে 'একদন্ত' বলা হয়। আবার স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে এইরূপ উপাখ্যান আছে যে, সিন্দুর নামে এক দৈত্য পার্বতীর গর্ভে অষ্টম মাসে প্রবিষ্ট হইয়া গণেশের মস্তক কর্তন করে। ইহাতে বালকের জীবননাশ হয় না, কারণ গণেশ দিব্যজ্যোতি, দিব্যতেজা; কিন্তু জন্মগ্রহণ করিলে পর নারদ মুণ্ডহীন দেহ দেখিয়া দিব্য নবজাতককেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তখন সেই বিবরণ জানিতে পারেন। তখন নারদ তাঁহাকে নিজেই নিজের মস্তক সংগ্রহ করিতে বলেন। দিব্যবালক তখন আপন তেজে গজাসুরের মস্তক কাটিয়া নিজদেহে সংযুক্ত করেন (গজাসুর এক বিশালকায় অসুর। মহেশ নামক এক নৃপতি নারদকে অপমান করিলে নারদের অভিশাপে অসুর হয়। পরে শিব গজাসুরকে নিধন করিয়া তাহার চর্মপরিধান করেন)। সেই হইতে গণেশের নাম হয় 'গজানন'। গণেশ জন্মের আরও একটি উপাখ্যান এই যে, পার্বতীদেবীর দিব্য গাত্র হইতে গণেশের

জন্ম হয়। মহাদেব পার্বতীকে প্রীত করিবার জন্য একটি গজমস্তক ইহার মস্তকহীন দেহে সংশ্লিষ্ট করেন। মহাদেবের করুণায় ইনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবন্ত হইয়া ওঠেন এবং মাতা

পার্বতীকে প্রদক্ষিণ করিয়া পাদ-বন্দনা দ্বারা আপন মহিমা ও পরমজ্ঞান-ভক্তি প্রকাশ করেন। পার্বতী ও মহাদেবের আশীর্বাদে ইনি ব্রহ্মাণ্ডে গণের অধিপতি, বিঘ্ন বিনাশক ও সর্বসিদ্ধিদাতা রূপে গণ্য হন। ('গণ' অর্থে প্রমথগণ, শিবের অনুচর ও শিবের ভৃত্যগণ। শিব ও পার্বতীর অনুচরদের 'গণ' বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিবের বাহন নন্দীকে গণদের প্রধান বলা হইয়াছে। এই গণরা সর্বদা শিব ও গণেশের কঠোর শাসনে থাকিত। অন্যায় আচরণ করিলে গণেদের কৈলাস হইতে মর্ত্যে নির্বাসিত করা হইত। অন্যদিকে 'গণদেবতা' বা মিলিত দেবতাগণের অধিপতিও শ্রীগণেশ। গণদেবতাদের আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। ইহারা সাধারণতঃ নয় ভাগে বিভক্ত। (১) আদিত্য - ১২ জন (২) বিশ্বদেব - ১০ জন (৩) বসু - ৮ জন (৪) তুষিত - ৩৬ জন (৫) আভাস্বর - ৬৪ জন (৬) বায়ু বা অনিল - ৪৯ জন (৭) মহরাজিক ২২০ জন (৮) সাধ্য - ১২ জন (৯) রুদ্র - ১১ জন। এই গণদেবতারা শিবানুচর; ইহাদের নেতা শ্রীগণেশ; ইঁহারা গণপর্বত কৈলাসে বাস করেন; ইহাদের স্থান দেবতাদিগের হইতে নিম্নস্তরে)। শ্রীগণেশ সর্বদাই তপস্যায় মগ্ন থাকিতেন। তুলসীর অভিশাপে গণেশকে বিবাহ করিতে হয়। গণেশের স্ত্রীর নাম 'পুষ্টি'।

দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীগণেশের খর্বাকৃতি দেহ, ত্রিনয়ন, চারি হস্ত এবং হস্তীর ন্যায় মস্তক। এক হস্তে শঙ্খ, এক হস্তে চক্র, তৃতীয় হস্তে গদা ও চতুর্থ হস্তে পদ্ম। মূষিক ইহার বাহন। কারণ, এই মূষিক বৃষরূপধারী ধর্মের অবতার; মহাবল ও পূজা সিদ্ধির অনুকূল। অতএব শ্রীগণেশ হইলেন আদ্যা মহাশক্তির পুত্র, সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ। ইহাই গণেশের শাশ্বত রূপ। শ্রীগণেশের শ্বেত-হস্তীর মস্তক প্রণবের প্রতীক। ইনি মহাঐশ্বর্য্যশালী, সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক ও মঙ্গলময়। দেবী পার্বতী 'গণেশ' রূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। 'শ্রীগণেশ' দিব্যের এক অনবদ্য অতি-আশ্চর্য্য সৃষ্টি।

তন্ত্রশাস্ত্রে তত্ত্বগতভাবে গণেশের অনেক প্রকার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল 'মহাগণেশ' রূপ। ইহা দুর্গা মহাশক্তির গণেশ রূপ। এই মহাগণেশের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আচারে পূজা হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক আচার সর্বশ্রেষ্ঠ; ইহা নিষ্কাম পরহিতকর পূজা। এই মহাগণেশের পূজা সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত কাহারও করিবার অধিকার হয় না। ইহা ছাড়া চতুর্হস্ত সমন্বিত শ্বেত, পীত, লোহিত এবং নীলবর্ণের গণেশ বিগ্রহও পূজা হইয়া থাকে। তত্ত্বগতভাবে 'শ্রীগণেশ' রূপ যোগীর ঋদ্ধি-সিদ্ধির দ্যোতক। শ্রীগণেশের স্ত্রী মহালক্ষ্মী স্বরূপা 'পুষ্টি' অর্থাৎ সাধকের শীলতারূপী সিদ্ধির প্রকাশ। সৃষ্টির সর্বস্তরে গণেশের অধিষ্ঠান। সাধকের বোধ-চেতনা বিকাশের পথে প্রত্যেক স্তরেই শ্রীগণেশের কৃপাস্পর্শলাভে সাধকের অধ্যাত্মজীবন পূর্ণ হইতে পরিপূর্ণ হয়।

শ্রীগণেশের আরও একটি প্রাজ্ঞরূপ আমরা দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের লিপিকাররূপে। ব্যাসদেব মহাভারত গ্রন্থ রচনাকালে লিপিকারের অভাবে চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে যান। তখন ব্রহ্মা ব্যাসদেবকে গণেশের শরণাপন্ন হইতে বলেন। ব্যাসদেব গণেশের শরণাপন্ন হইলে পরে গণেশ একটি শর্তে মহাভারতের লিপিকার হইতে রাজী হন। শর্তটি হইল — তিনি যখন মহাভারত লিখিতে আরম্ভ করিবেন, তখন লেখার কোন বিরতি ঘটিতে দেওয়া চলিবে না। ব্যাসদেবও তখন গণেশকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লন যে কোন শ্লোক লিখিবার পূর্বে শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া তবে লিখিতে হইবে। ইহাতে ব্যাসদেবের সুবিধাই হয়। তিনি দুরূহ শ্লোক রচনা করিয়া গণেশের লেখায় মাঝে মাঝে বিলম্ব করাইয়া দিতেন এবং সেই অবসরে ব্যাসদেব নূতন নূতন শ্লোক রচনা করিয়া ফেলিতেন। এইভাবে সমগ্র মহাভারত লিখিত হয়। মহাভারতের প্রাজ্ঞ লিপিকার শ্রীগণেশ মহাভারতের যোগশাস্ত্রকে অধ্যাত্ম-জ্ঞানের দৃষ্টি ভঙ্গিতে প্রথম স্ফুরিত করেন। মহাভারতের বিভিন্ন শ্লোকের মধ্যে যে নিগুঢ় যোগতত্ত্ব রহিয়াছে, শ্রীগণেশের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে তা সর্বপ্রথম প্রস্ফুটিত হয়। তাই এই মহাপ্রজ্ঞা সম্পন্ন পার্বতী পুত্র শ্রীগণেশকে বারংবার আমাদের ভক্তি-বিনম্র প্রণাম জানাই।

—ওম্ নমঃ শ্রীগণপতয়ে—

জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীসর্বাণীমাকে বিশেষ অনুরোধ, উনি যদি ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর ১৮টি পত্রের সাধন মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর উপর আলোকপাত ও ব্যাখ্যা 'হিরণ্যগর্ভ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন তা হলে একটা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। পরে তা পুস্তকে রূপ দেওয়া যেতে পারে। **—শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত**

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গে:—

মরমী সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়কে জ্ঞানগঞ্জের সাধন মার্গের ক্রিয়াযোগের যে সকল নিগুঢ় তত্ত্ব, তথ্য এবং সাধন প্রণালীর বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তারই কয়েকটি প্রশ্ন :—

৬। পত্র ৭) দ্বিতীয় ভাগ -

''১০৮ যোগক্রিয়াটি স্বতন্ত্র্য - উহা পুরুষোত্তম ভাবের নির্দ্দেশক। উহাই পূর্ণ স্বতন্ত্র্যরূপ চিদ্ সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা স্বরূপ'' — (এর ব্যাখ্যা)

উত্তর — পত্র ৭-এর দ্বিতীয় ভাগ — ১০৮-এ পুরুষোত্তম ভাবের সাধনা। ইহা পরমশিবের নারায়ণ তত্ত্বে উপনীত হইবার সাধনা। এই সাধনা পরমযোগের সাধনা, মহাকারণ ভূমির চেতনার সাধনা। এই যোগে উন্নীত হইলে যোগীশ্বরের নিকট দিব্যলোক উদ্ভাসিত হয় এবং দিব্য-ভূমির দিব্যজ্ঞানের স্ফুরণ হয় যোগী সত্তায়। যোগী তখন দিব্য-চক্ষু লাভ করেন। হিরণ্যগর্ভ হইতে এই পুরুষোত্তম ভাবের সাধনা আরম্ভ হয়। গীতায় আছে, পরমব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপই অক্ষর-পুরুষ বা অক্ষরভাব আর পুরুষোত্তম ভাবে তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা এবং সর্বভূতের ''গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ''— ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সমগ্র স্বরূপ। অতএব, এক্ষেত্রেই পুরুষোত্তমের স্বতন্ত্রতা প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিতেছেন -''অক্ষর হইতেও আমি উত্তম।'' অর্থাৎ, প্রকৃতি (মহাগুণ বা চিৎশক্তি মহামায়া) হইতে পরমশ্বের (চিদ্) উত্তম। গোপীনাথজী বলিয়াছেন, ''বোধ হইতে ভাব পর্য্যন্ত যোগমায়ার প্রভাব তারপর গুণ হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত শুদ্ধ মায়ার খেলা। শুদ্ধমায়া অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাজ্ঞানের উদয় হয়, যাহার ফলে 'চরণ' দর্শন হয়। 'চরণ' প্রাপ্তিই বস্তুতঃ মহামায়া রূপে স্বরূপ স্থিতি (অর্থাৎ, চিৎ প্রকৃতির জ্ঞান পূর্ণরূপে নিজবোধের মধ্যে স্ফুরিত হয়) — ইহা ১০৭। ইহার পর 'চিদ্' — যাহাকে পুরুষোত্তম বলা যায়, আবার বিশুদ্ধ গুরুও (অর্থাৎ যিনি সকল উপাধি বর্জিত গুরু) বলা যায়, এইখানেই সংখ্যা পূর্ণ হয়।

গীতায় ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের কথা আছে। আচার্য্য শংকরের মতে ''কার্য্যোপাধিযুক্ত যাহা ভৌতিক ও বিনশ্বর পদার্থ, তাহাই ক্ষর এবং কারণোপাধিযুক্ত অবিনশ্বর মায়াশক্তিই 'অক্ষর' পুরুষ।'' শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন - 'পুরুষ দুই প্রকার। যাহাদের আসক্তি সমন্বিত বিষয়াদিতে দৃষ্টি রহিয়াছে, তাহারা দেহ সম্বন্ধী বদ্ধজীব তাহাদের চৈতন্যমাত্র ভূতাত্মায় পর্য্যবসিত; ইহারাই জন্মমৃত্যুর চরকীতে চড়িয়া বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। আর যাহাদের দৃষ্টি কূটস্থে নিবদ্ধ, তাহাদের মন দেহ সম্বন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া সেই প্রত্যগাত্মায় নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের (জীবের) মন প্রত্যগাত্মার সহিত মিলিত হইয়া পরে পরমাত্মার সহিতও মিলিয়া যাইবে — এই জন্যেই তাঁহারা অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হন, সুতরাং তাঁহারা স্বয়ং অক্ষর স্বরূপ হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহাদের দেহে আত্মবোধ নাই, তাঁহাদের ত্রিকূটীতে পরম স্থিতিলাভ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা অভয় ও অমৃতপদ লাভ করিয়াছেন।'' গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন পরমাত্মাই পুরুষোত্তম বা পরমেশ্বর। ''উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোক ত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্তব্যয় ঈশ্বরঃ।'' —গীতা ১৫ অঃ, ১৭ শ্লোক)। এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিলক্ষণ অন্য একটি পুরুষই উত্তম পুরুষ। সেই উত্তম পুরুষের লক্ষণ হইল যে তিনি পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিতে কথিত। অর্থাৎ, তিনি পরম, এইরূপ আত্মা। তিনি আত্মা বলিয়া অচেতন ক্ষর হইতে বিলক্ষণ, আর পরমত্ব হেতু ভোক্তা অক্ষর পুরুষ হইতেও বিলক্ষণ, এই তাৎপর্য্য। তাঁহার পরমাত্মত্বই দেখাইতেছেন যে সেই ঈশনশীল ঈশ্বর অব্যয় এবং নির্বিকার

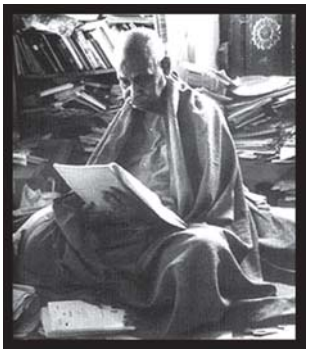

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

হইয়াও লোকত্রয়ের হৃদয়ে আবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক প্রাণীকেই পালন করিতেছেন। যোগী কূটস্থ মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে, কূটস্থ দেখিতে দেখিতে পরে এক উত্তম পুরুষ দেখিতে পান। — শাস্ত্রে যাহাকে পরমাত্মা কহে। হিরণ্যগর্ভস্থিত কূটস্থেই সর্বাগ্রে দর্শন হয়। তাহা হইতেই সমস্ত ভূত জাত; তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা। এই হিরণ্যগর্ভ কূটস্থের মধ্যেই পুরুষোত্তম রহিয়াছেন। কূটস্থ দর্শন করিতে করিতে যোগী তাহার মধ্যেই উত্তম পুরুষকে দেখিতে পান। ইহাই পুরুষোত্তম রূপ। এ অবস্থায় যোগী উপনীত হইলে তখন সমষ্টিগতভাবে প্রাণতত্ত্বকে অধিগত করিতে সক্ষম হন। এই উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম দর্শনে যোগীর বোধ চেতনায় পুরুষোত্তম ভাবের উদয় হয়। পুরুষোত্তমের মধ্যে জড়ের ধর্ম থাকে না। ইহা শুদ্ধ চৈতন্যজ্যোতিঃ মাত্র হইয়াও কর্তা ও ঈশান ভাব সমন্বিত, যিনি সকলের হৃদয়স্থ হইয়াও হৃদয়ভাব দ্বারা অনাবৃত, ইনিই নরাকৃতি নারায়ণ পুরুষোত্তম বা ভগবান। এই পুরুষোত্তম হইলেন 'আত্মনারায়ণ পরম'। পরম আত্মনারায়ণের জ্ঞান হইতেই পুরুষোত্তম ভাবের ব্যাপ্তির সূচনা হয়। এ অবস্থাকে পরম শিবাবস্থাও বলা যায় এই অবস্থা হইতেই যোগীর চেতনা পরপরাবস্থায় উপনীত হইয়া বিরাটের সমষ্টিবোধে চিরন্তন শাশ্বত নিত্যে উপনীত হয়। হিরণ্যগর্ভস্থিত পুরুষোত্তমের সহিত বিরাটের সংযোগ রহিয়াছে বলিয়া এ অবস্থাও নিত্য। অতএব পুরুষোত্তম চেতনা নিত্য হওয়ার জন্যে নিত্যের নিত্য গতিলাভ হওয়া সম্ভব হয়, যারফলে যোগীশ্বরগণ মহাকারণ ও কারণভূমিতে অনায়াসে যাতায়াত করিতে সক্ষম হন। এই অবস্থা হইতেই যোগীর পূর্ণস্বাতন্ত্র্যরূপ চিদ্‌সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা হয়।

পুরুষোত্তমভাবের ব্যাপৃতিতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে পুরুষোত্তম ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতে উত্তম, পরিবর্তনশীল বস্তুরও তিনি ঊর্দ্ধে। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ভাষায় —''মায়িক সৃষ্টির সহিত কৃষ্ণের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই। তিনি একলেশ্বর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর, এই স্বতন্ত্র ঈশ্বরই পুরুষোত্তম - নিত্যকৃষ্ণ।''

(আত্মজ্ঞানের ব্যাপৃতিতে পুরুষোত্তম অবস্থার বর্ণনা :—

গীতার ব্যাখ্যায় পূর্বে বলা হইয়াছে যে জীব পরমাত্মার সহিত এক হইয়াও যেরূপ তাঁহা হইতে প্রাণ-প্রবাহের মধ্য দিয়া জাগ্রদাবস্থায় বা স্থূল শরীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ঠিক বিপরীত মুখেই ইহাকে আবার স্বস্থানে স্বীয় কেন্দ্রে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে। এই প্রত্যাবৃত্ত হইবার পথানুসরণকেই সাধনা বলে। প্রধানতঃ জাগ্রৎ ভূমিকা - স্থূল দেহ, পরে স্বপ্ন ভূমিকা বা সূক্ষ্ম দেহ, পরে সুষুপ্তি বা কারণ দেহকে অতিক্রম করিয়া যোগীকে চুতর্থ ভূমি বা তুরীয় ভূমিতে পৌঁছাইতে হইবে। ছান্দোগ্যে আছে আত্মজ্ঞানীদের প্রাণ স্থির হয়। ঐ স্থির-প্রাণ লইয়াই যোগীগণ তুরীয় পদে উপনীত হইতে পারেন। ত্রিলোকে যাহা অবস্থিত আছে, সে সমস্তই প্রাণের বশীভূত আত্মা বা পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জন্মলাভ করে। পুরুষ-দেহে যেরূপ ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই প্রাণও আত্মাতে অনুগত থাকে এবং মনঃ সম্পাদিত কোষাদি দ্বারা এই স্থূল শরীরে তাঁর আগমন হয়। প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্র — তিনিই কূটস্থ, জীবাত্মা ইঁহারই কিরণ মাত্র। এই চিৎকণ প্রত্যগাত্মাও শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব। এই চিৎকণ যে কত তাহার সংখ্যা নাই। এই চিৎকণগুলিই 'একোহহং বহুস্যাম'-এর বহু। কিন্তু বহু হইয়াও উহা এক অদ্বিতীয়ের সহিত সর্বদা যোগযুক্ত। এই চিন্মাত্র পুরুষই অনন্ত চিদাকাশের বক্ষে প্রতিক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই চিদাকাশই অব্যক্ত পরব্রহ্মের কতকটা ব্যক্তভাব। যেন শিবের সহিত শিবানী মিলিত। সেই অব্যক্ত ভাবকে যিনি বুঝিতে সক্ষম তিনি পুরুষ শ্রেষ্ঠ, উত্তম পুরুষ। সেই ব্রহ্মসংযুক্ত আদ্যাশক্তি হইতে যে নাদ (মহৎ) উৎপন্ন হইয়াছে সেই নাদ হইতেই বিন্দুর (অহংকার তত্ত্বের) উৎপত্তি হয়। বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক ও নাদ শিব-শক্ত্যাত্মক। এই বিন্দু-বীজ ও নাদ হইতে ত্রিশক্তি - জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎপত্তি হইয়াছে। এই চেতন ভোক্তা পুরুষই চিৎকণ। ইনিই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, ইনি ধূমহীন জ্যোতির মত, ইনিই অন্তরাত্মা। ইনি সকল জীবদেহের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। মুঞ্জাতৃণ হইতে যেমন ঈষিকা (কাশতৃণ) পৃথক করা যায়, তেমনি ঐ পুরুষকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। পরে ঐ চিদংশও এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মধ্যে যেন ডুবিয়া যায়। কারণ অসংখ্য ঘটে একই সূর্য্যের অসংখ্য প্রতিবিম্ব পড়ে। অসংখ্য ঘটোপাধির বিনাশের সহিত ঐ সকল চিদাভাসগুলির কোন অস্তিত্ব থাকে না। তখন কেবল একই বর্তমান থাকে; এক বলিবারই কেহ থাকে না —''সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্''-(ছান্দোগ্য)। ইহাই মায়ার বা চিৎকণের আত্ম-বিলোপন। যে খেলা আরম্ভ হইয়াছিল, সে খেলা ফুরাইয়াই গেল। ইহাই কৈবল্যাবস্থা। এইখানেই কর্মের নিবৃত্তি হয়। কৈবল্যাবস্থায় উপনীত

যোগীশ্বরগণ জীবন্মুক্ত হন। কৈবল্যপাদ লাভ করিয়া যোগী বৃহৎ-কূটস্থ মধ্যে 'হিরণ্যগর্ভ' কূটস্থের রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। এখন হইতেই আরম্ভ হইল পুরুষোত্তম ভাবের সাধনা। এই হিরণ্যগর্ভ কূটস্থের মধ্যে প্রথমে সর্বভূতময় শিবজ্ঞানের জ্ঞান হয়। তৎপরে ঈষণশীল সর্বজ্ঞ নারায়ণ দর্শন হয়। উহাই পুরুষোত্তম-রূপ। উত্তম পুরুষ পুরুষোত্তম কূটস্থ মধ্যেই চিদাকাশে প্রতিবিম্বিত হন। কূটস্থের মধ্যেই সাধনার পরিপক্কাবস্থায় ইঁহাকে যোগী-সাধকগণ দর্শন করিয়া থাকেন। ইনি হেমাণ্ড-কূটস্থ জ্যোতিস্বরূপ, আবার কখনো তেজের শান্তরূপে গাঢ় ঘন নীলবর্ণ। সেই অণ্ডের মধ্যেই সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ রহিয়াছেন। এই চিজ্জ্যোতি কূটস্থমণ্ডলে বা হিরণ্যগর্ভে পুরুষোত্তমকে যাঁহারা সদ্‌গুরু কৃপায় দেখিতে পান, তাঁহারা ধন্য।) *—যোগ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা*

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

পুরাণ কথা

মান্ধাতা ও বিন্দুমতী

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

ইক্ষ্বাকুবংশে যুবনাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। যুবনাশ্বের পত্নীর নাম ছিল গৌরী। রাজা পরম ধার্মিক ছিলেন। তিনি অশ্বমেধানুষ্ঠান ও অন্যান্য বহুবিধ প্রধান প্রধান যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তথাপি রাজা সন্তানের মুখদর্শনজনিত সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত ছিলেন। সেই কারণে রাজা অমাত্য হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক যোগ সাধন কামনায় মুনিদের আশ্রমে বনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। কালক্রমে মুনিরা যুবনাশ্বের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পুত্র উৎপাদনের জন্য যজ্ঞারম্ভ করেন। ভৃগুনন্দন যুবনাশ্বের পুত্রলাভার্থ এক যজ্ঞ করেন। মধ্যরাত্রে যজ্ঞ নিবৃত্ত হইলে পরে মুনিরা মন্ত্রপূত এক কলসী জল বেদীর উপরে রাখিয়া নিদ্রা যান। রাজ মহিষী বিন্দুমতী সেই মন্ত্রপূত জল পান করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় এক পুত্র প্রসব করিবেন এই মনে করিয়া যজ্ঞ বেদীর উপর কলসী রাখিয়া মহর্ষিগণ নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময় পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ যুবনাশ্ব সেই জল পান করিয়া গর্ভধারণ করিলেন। মুনিরা জাগ্রত হইলে পরে দেখিলেন যে কলসী জলশূন্য। তখন যুবনাশ্বের স্বীকারোক্তি শুনিয়া মুনিরা বলিলেন —"আপনার পুত্রোৎপত্তির জন্যই এই তপঃ-সিদ্ধ জল রাখিয়াছিলাম। জলপানের ফলে আপনিই পুত্র প্রসব করিবেন কিন্তু গর্ভধারণের ক্লেশ হইতে মুক্তি পাইবেন।" শতবর্ষ পূর্ণ হইলে পরে যুবনাশ্বের বামকুক্ষি ভেদ করিয়া এক সূর্য্যতুল্য তেজস্বী পুত্র নির্গত হইল। কিন্তু মাতৃস্তন দুগ্ধ অভাবে পুত্র কি পানকরতঃ জীবিত থাকিবেন, রাজা এই কথা চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় ইন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই বালক আমাকে ধারণ করিবে" -"ধাস্যতি মাময়ং" অর্থাৎ, আমার সাহায্যে জীবিত থাকিবে। এইজন্যে দেবগণ তাঁহার নাম রাখিলেন 'মান্ধাতা'। ইন্দ্র তখন বালকের মুখে নিজের অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে বালক সেই অঙ্গুলি চুষিতে লাগিলেন। মান্ধাতা ইন্দ্রের অঙ্গুলি হইতে নির্গত দুগ্ধধারা পান করিয়া দ্বাদশ দিনের মধ্যে দ্বাদশবর্ষীয় বালকের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট হইলেন। ইন্দ্রতুল্য বলশালী মান্ধাতা একদিনেই সমগ্র পৃথিবী অধিকার করেন। এই রাজচক্রবর্তী মান্ধাতা প্রভূত নানাবিধ সকাম যজ্ঞ করিয়া সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। তিনি একশত অশ্বমেধ ও একশত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া সুবর্ণময় রোহিত মৎস সকল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন।

দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া লঙ্কাধিপতি রাবণ অযোধ্যাধিপতি মান্ধাতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। উভয়েই তুল্য বলশালী হওয়ায় তখন কাহারও জয় পরাজয় কিছুই হয় নাই। পরিশেষে গালব ও পুলস্ত্য ঋষিদ্বয়ের মধ্যস্থতায় উহাদের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হয়।

মান্ধাতার রাজত্বকালে একবার দানবেরা প্রবল হইয়া লোক সকলের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। তখন মান্ধাতা ভগবান নারায়ণের সাক্ষাৎলাভের জন্য এক যজ্ঞ করেন। বিষ্ণু ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া সেই যজ্ঞে মান্ধাতাকে দর্শন দেন এবং ক্ষাত্রধর্ম বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করেন। ব্রহ্মবেত্তা উতথ্য মান্ধাতাকে রাজধর্ম বিষয়ে উপদেশ দেন। বশিষ্ঠ ঋষি মান্ধাতাকে ফাল্গুন মাসের শুক্ল একাদশীর আমলকী ব্রতের উপদেশ প্রদান করেন। একবার মান্ধাতার রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে মান্ধাতা অঙ্গিরা ঋষিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অঙ্গিরা বলেন যে একজন শূদ্র মান্ধাতার রাজ্যে তপস্যা করিয়াছিল তজ্জন্যেই

অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। এই বলিয়া অঙ্গিরা মান্ধাতাকে সেই শূদ্রকে বধ করিতে বলেন। কিন্তু মান্ধাতা তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় অঙ্গিরা তখন তাঁহাকে শ্রাবণের শুক্লা একাদশীতে পদ্মাব্রত করিবার উপদেশ দেন। বসুহোম নামক একজন রাজা মান্ধাতাকে দণ্ডনীতির উৎপত্তির বিষয় বর্ণনা করেন। সূর্য্যের উদয় হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান মান্ধাতার অধিকৃত ছিল। বিষ্ণুর অংশসম্ভূত মান্ধাতা যজ্বা ও অমিততেজা ছিলেন। বিধিমতে গোদান করিয়া মান্ধাতা স্বর্গলাভ করেন।

রাজা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতী মান্ধাতার পত্নী ছিলেন। বিন্দুমতীর অপরনাম চৈত্ররথী। বিন্দুমতী অতীব ধর্মপরায়ণা ও পতি পরায়ণা ছিলেন। তিনি নিজের অযুত সংখ্যক ভ্রাতার জ্যোষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। সেই সময় ভূলোকে তাঁহার তুল্য সৌন্দর্য্যশালিনী আর কেহই ছিলেন না। বিন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, মুচুকুন্দ ও অম্বরীষ জন্মগ্রহণ করেন। পুরুকুৎস আদি তিন পুত্র ভিন্ন মান্ধাতার পঞ্চাশটি কন্যা জন্মে। ঐ সব কন্যাকে সৌভরি ঋষি বিবাহ করেন। দেবীপুরাণ মতে মান্ধাতা তৃতীয় মন্বন্তরে ইন্দ্র হইয়াছিলেন।

মান্ধাতা সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া যখন দেবলোক অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন তখন ইন্দ্র তাহাতে অতীব ভীত হইয়া মান্ধাতাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন, ''আপনি প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পৃথ্বীর অধিপতি হইতে পারেন নাই। সমগ্র পৃথিবী জয় না করিয়া আপনি কি বলিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে মনস্থ করিয়াছেন?'' তখন মান্ধাতা দেবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''এই পৃথিবীতে এমন কে আছেন যিনি আমার আধিপত্য স্বীকার করেন না?'' ইন্দ্র বলিলেন যে মধুপুত্র লবণাসুর মান্ধাতার বশ্যতা স্বীকার করেন না। তখন মান্ধাতা লবণাসুরকে জয় করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লবণের হস্তে মান্ধাতা নিহত হন। (মধুদৈত্যের পুত্র ছিলেন লবণাসুর। মধু ব্রাহ্মণভক্ত ও আশ্রিত বৎসল ছিলেন। মহাদেব প্রীত হইয়া নিজের শূলের ন্যায় এক শূল ইহাকে উপহার দিয়া বলিয়াছিলেন, মধু দেব-ব্রাহ্মণের বিরোধিতা না করিলে এই শূল তাঁহার কাছেই থাকিবে এবং এই শূল শত্রুকে ভস্ম করিয়া মধুর হাতে ফিরিয়া আসিবে। মধু তখন প্রার্থনা করেন এই শূল যেন চিরকালই তাহার বংশের অধিকারে থাকে। মহাদেব ইহাতে অসম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন যে মধুর এক পুত্র মাত্র এই শূলের অধিকারী হইবে। মধুর পুত্র লব। সে ওই শূলের অধিকারী হইয়াছিল।)

(*সহায়ক গ্রন্থ—বিষ্ণুপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণ*)

কুরুক্ষেত্র দেখে এলাম

(১)

কথায় বলে 'রথ দেখা আর কলা বেচা' দুটো একই সঙ্গে হয়ে গেল। না, আমি কিছু বেচতে ঘর থেকে বের হইনি। এবার আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভ্রমণের, আমাদের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ৫৪ তম আচার্যদেব শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবার জন্মস্থান 'লোনাকাডারি' দর্শন করার, তার সঙ্গে কুরুক্ষেত্র এবং চণ্ডীগড়টা ঘুরে আসা।

শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবার অসীম কৃপায় তাঁর জন্মস্থানের স্মৃতি মন্দির দেখার সৌভাগ্য হয়। দুমিনিট পর সেই মন্দিরে গেলে আমি আর মন্দিরে প্রবেশ করতে পারতাম না, কারণ পূজারিজী মন্দিরে পূজা সেরে দরজায় তালা দিয়ে চলে যাবেন, ঠিক সেই সময় আমি সেই মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হই। আমার দীর্ঘ দিনের আশা পূর্ণ হয়।

এবার আমার দ্বিতীয় ভ্রমণস্থল হল কুরুক্ষেত্র। হিন্দুদের কাছে কুরুক্ষেত্র এক মহান তীর্থস্থান। পুরাকালে রাজা কুরু এইস্থানে কঠোর তপস্যা করেন, সেই থেকে এই স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র হয়। অতীতে কুরু-পাণ্ডবদের ১৮ দিন ব্যাপী ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল, এই কুরুক্ষেত্রেই। পূর্বে কুরুক্ষেত্র অখণ্ড পাঞ্জাবের অন্তর্গত হলেও বর্তমানে কুরুক্ষেত্র হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত। ১৯৬৬ সালে ১লা নভেম্বর পাঞ্জাবের হিন্দী ভাষী এলাকাকে নিয়ে নতুন রূপ পেয়েছে হরিয়ানা রাজ্য। হরিয়ানা অর্থাৎ দেবলোক। পুরাকালে দেবতারা অখণ্ড পাঞ্জাবের এই হরিয়ানা প্রদেশেই

বসবাস করতেন।

স্বজন নিধন করতে হবে বলে ব্যাকুল অর্জুন যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে চান বলে যখন অস্ত্র ত্যাগ করতে যান, তখন তাঁর রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, মোক্ষযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে অসাধারণ নীতি সম্পন্ন ভাষণ দেন এই কুরুক্ষেত্র ধর্মযুদ্ধে, তা অমূল্য বাণী হয়ে ভগবৎ গীতায় স্থান পেয়েছে। ভগবৎ গীতা হিন্দুদের কাছে এক অমূল্য অমৃত সমান ধর্ম পুস্তক।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে এই স্থানটি ব্রহ্মবেদী, সমন্থ পঞ্চক প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। এর চতুঃসীমা তবন্তক, অরন্তক, রামহ্রদ ও মচক্রুক নামে পরিচিত ছিল। এখানে সরস্বতী, দৃশদ্বতী, অরন্তক, রামহ্রদ ও মচক্রুক চারদিক ঘিরে আছে। এই জেলা আগে আমিন, শোনপথ, পানিপথ, ও কর্ণালের সঙ্গে যুক্ত ছিল। উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃশদ্বতী, থানেশ্বর ও তার চারপাশের বিস্তৃত স্থানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল। দ্বৈপায়ন হ্রদ বা রামহ্রদ যার বর্তমান নাম, বস্থালি; থানেশ্বর থেকে ১৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। থানেশ্বর থেকে ৫ মাইল দক্ষিণে 'আমিনে' অর্জুন পুত্র অভিমন্যুকে চক্রবদ্ধ করে হত্যা করা হয় এবং অশ্বত্থামা পরাজিত হন। এই আমিনে মাতা অদিতি সূর্যের জন্ম দেন। চক্রতীর্থে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রে ভীষ্মকে নিহত করতে যান। থানেশ্বর থেকে ১১ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে নাগদ্ধতে ভীষ্ম স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেন। থানেশ্বরের পশ্চিমে অস্তিপুরে মৃতযোদ্ধাদের অগ্নিসংস্কার করা হয়। যে পাঁচটি গ্রাম পাণ্ডবরা চেয়েছিলেন, শোণপ্রস্ত ও পাণিপ্রস্থ বা পাণিপথ অন্যতম, কিন্তু দুর্যোধন তা দিতে অস্বীকার করায় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধ ১৮ দিন ব্যাপী চলে। এই যুদ্ধে মাত্র ৭ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে পাণ্ডবেরা কৌরবদের ১১ অক্ষৌহিণী সৈন্যদের পরাজিত করে এবং ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

এই কুরুক্ষেত্র দেবতাদের বাসস্থান বলে শতপত ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে। রাজা মান্ধাতা এখানে যজ্ঞ করেছিলেন। ভীষ্ম এবং পরশুরামের যুদ্ধ এইখানেই হয়। বনবাসের সময় পাণ্ডবরা এখানে কিছুদিন ছিলেন। এই সব কারণে কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলা হয়।

সরস্বতী এবং দৃশদ্বতী নদীর মাঝের বিস্তীর্ণ ৪৮ ক্রোশ ক্ষেত্রের নাম ছিল ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। এই জমি ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন জায়গায় কৌরব এবং পাণ্ডবদের পূর্বপুরুষদের জমি ছিল। বারমাসই সরস্বতী নদীর পর্যাপ্ত জল পাওয়া যেত। জনবসতিও কম থাকার জন্য কুরুক্ষেত্রকে কৌরব ও পাণ্ডবরা দুইপক্ষই এই কুরুক্ষেত্রকে যুদ্ধক্ষেত্র রূপে মনোনীত করেন।

পুরাণে আছে যজ্ঞের সর্বপ্রথম উচ্চারণ এখানেই হয়েছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা বিভিন্ন যজ্ঞের আয়োজন এখানেই করেছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র মুনিদের ঈশ্বরীয় ব্রহ্মজ্ঞান এইখানেই লাভ হয়েছিল। ঋগ্বেদ, উপনিষদ, মহাভারত রচনাও এখানেই সরস্বতী নদীর তীরে হয়েছিল।

পুরাণে সূর্যগ্রহণের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাহুদ্বারা সূর্য গ্রাসাচ্ছাদিত হয়ে পড়লে সূর্যগ্রহণ হয়। এই সময়ে কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্মকুণ্ডে ও সন্নিহিত সরোবরে স্নান করলে একশো অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। সেই ব্যক্তির সব ইচ্ছা পূরণ হয়। পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে সেখানকার সব নদী, কুণ্ড, ঝরণা এবং সরোবরের জল অমাবস্যার দিন এখানে মিলিত হয় এবং এখানে স্নান করলে সব পাপ নষ্ট হয়। নারদ পুরাণে আছে ব্রহ্মা এই সরোবর তৈরী করেন।

শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম যখন দ্বারকায় রাজত্ব করছিলেন, একবার এক সূর্যগ্রহণের সময় তাঁরা বসুদেব এবং উগ্রসেনদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এসে ছিলেন। এইদিন বৃন্দাবন থেকে নন্দরাজ মা যশোদা, শ্রীরাধা, ললিতা, বিশাখা এবং অন্যান্য গোপীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে আসেন। দীর্ঘ বছর পর শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা দুজনের দর্শন হয়। তখন দুজনেই প্রৌঢ়ত্বে উপনীত। তাঁদের দুজনের অপরূপ দেহ সৌন্দর্য্য অটুট থাকলেও কেশ কুণ্ডলে তখন রূপালী রেখার ঝিলিক দেখা দিয়েছে। সূক্ষ্ম দেহে তাঁদের দুজনের কখনও বিচ্ছেদ না ঘটলেও স্থূল দেহে দুজনের বহু বছর পর এই দেখা। দুজনে দুজনের দিকে অপলক প্রেমময়, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। দুজনের চোখ দিয়ে তখন অনুরাগ, ব্যথার অশ্রুধারা বয়ে যায়। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীরা রাধা-কৃষ্ণকে ঘিরে অপলক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকে। তাঁদের চোখ দিয়েও কৃষ্ণের সঙ্গে দীর্ঘ বিরহের জন্য অবিরাম অশ্রুধারা বয়ে যায়। শ্রীরাধা মনে মনে অভিমানের সুরে শ্রীকৃষ্ণকে বলতে চান — হে প্রিয়, হে সখা, এত দিন পর তুমি আমাকে দর্শন দিলে? এক অসাধারণ অবিস্মরণীয় দিন, রাধা-কৃষ্ণ মিলন অনুষ্ঠিত হয় এই কুরুক্ষেত্রে। *...ক্রমশঃ*

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৫)

তস্মাৎ পরতরং নাস্তি নেতি নেতীতি বৈ শ্রুতিঃ।
কর্ম্মণা বচসা চৈব সর্ব্বদারাধয়েদ্ গুরুম্।।৫২

(গুরোঃ) পরতরং নাস্তি তস্মাৎ নেতি নেতি ইতি বৈ শ্রুতিঃ, (অতএব) কর্ম্মণা, বচসা চ এব সর্ব্বদা গুরুম্ আরাধয়েৎ।।৫২

গুরুব্যতিরেকে আর কিছু নাই বলিয়া শ্রুতিতে 'নেতি নেতি' পদের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ গুরু ভিন্ন অপর বস্তু যাহা কিছু জগতে দৃশ্যমান হইতেছে, তাহা গুরু ভিন্ন অপর কিছু নহে, ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন। অতএব বাক্যের দ্বারা উক্ত, অথবা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কৃতকর্ম্ম সমূহ সর্ব্বদা গুরুর আরাধনা দ্বারা করিবে অর্থাৎ গুরুতে লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত কর্ম্ম করিবে। ৫২

গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সদাশিবঃ।
সৃষ্টাদিকম্ সমর্থাস্তে কেবলং গুরুসেবয়া।। ৫৩

গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সদাশিবঃ কেবলং গুরুসেবয়া তে সৃষ্ট্যাদিকং (কর্ম্ম কর্ত্তুং) সমর্থাঃ।। ৫৩

ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্টির কল্পনা হয়, ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্ট বস্তু রক্ষিত হয়, এবং ইচ্ছার দ্বারা রক্ষণের ইচ্ছার নাশ হইয়া সৃষ্টবস্তু মন হইতে অপসারিত হইয়া তাহার নাশ হয়। তত্তৎ ইচ্ছার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হইতেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সদাশিব। গুরুব্রহ্ম (কূটস্থব্রহ্ম) হইতেছেন ভাবময় পুরুষ, তাঁহা হইতে সমস্ত ভাবের উৎপত্তি হইয়া ইচ্ছার কারণ হয়। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁহারই অনুগ্রহে ভাবান্বিত হইয়া ইচ্ছাবলে স্ব-স্ব কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছেন, সুতরাং গুরুই সকল কর্ম্মের একমাত্র মূলীভূত কারণ এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য-দেবতা — অর্থাৎ বুদ্ধিস্থানে মনের স্থিতি না হইলে বিক্ষিপ্তাবস্থায় কোন কর্ম্ম হয় না বলিয়া, মনের সংযমের দ্বারা বুদ্ধিস্থানে স্থিতির প্রয়োজন হইয়া থাকে, এবং কূটস্থব্রহ্মই বুদ্ধির স্বরূপ।। ৫৩

দেব কিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষচারণাঃ।
মুনয়োরপি ন জানান্তি গুরুশুশ্রূষণাবিধিম্।। ৫৪

দেবাঃ, কিন্নরাঃ, গন্ধর্ব্বাঃ, পিতরঃ, যক্ষ্মাঃ, চারণঃ মূনয়ঃ অপি গুরু শুশ্রূষণা-বিধিৎ না জানন্তি।। ৫৪

দেব - স্বর্গে থাকিয়া যিনি ক্রীড়া করেন। ইনি ব্রহ্ম সঙ্গে আনন্দানুভূতিতে থাকেন, পরন্তু ব্রহ্মে লয় হইয়া শান্তিপ্রার্থী নহেন।

কিন্নর - (কিং - কুৎসিৎ, নর - নরদেহ বিশিষ্ট পুরুষ।) ইহার অশ্বের ন্যায় মুখ এবং নরের ন্যায় শরীর। এই পুরুষ মনুষ্যদেহ বিশিষ্ট হইলেও অশ্বগুণসম্পন্ন (ইচ্ছাবশে কার্য্যকরে বলিয়া অশ্বগুণসম্পন্ন, গীতার ভূমিকা দেখ) অর্থাৎ বহু ইচ্ছার অধীন হইয়া সকামভাবে কার্য্য করে।

গন্ধর্ব্বগণ - যাঁহাদের গানই ধর্ম্ম, অর্থাৎ যাঁহারা (ওঁকার রূপ) শ্রুতি অবলম্বনে আছেন।

পিতৃগণ - যাঁহারা চন্দ্রলোকে বাস করেন (অর্থাৎ সকামভাবে সাধন করিয়া যাঁহাদের চন্দ্রলোকে বসতি হইয়াছে।)

যক্ষঃ - দেবযোনিবিশেষ ধনরক্ষক। যে পুরুষ জগতের ঐশ্বর্য্য লাভের অভিপ্রায়ে ধর্ম্মকর্ম্ম করেন।

চারণ - শ্রুতি পাঠক। যে ব্যক্তি বাহ্যভাবে ব্রহ্মের শ্রুতিপাঠে রত, সুতরাং তাঁহার অধমভাবে পূজা হয়। (স্তুতির্জপোহধমো ভাবঃ।)

মুনি - যিনি মনকে জানেন, এবং ব্রহ্মকে জানিবার জন্য রোধপন্থা অবলম্বনে সংযম-সাধনে রত আছেন।

ইঁহারা কেহই গুরু শুশ্রূষণা বিধি জানেন না; অর্থাৎ, দেবভাবাপন্ন পুরুষের যতক্ষণ আনন্দানুভূতি (দেব শব্দের অর্থ ২৮ শ্লোকে দেখ) রহিয়াছে, ততক্ষণই ব্রহ্মসেবা সম্যক্‌ভাবে হইতেছে না; কারণ জগৎ সম্পর্কে আনন্দ নাই এবং ব্রহ্মসঙ্গে আনন্দ আছে, ইহা তিনি বুঝিতেছেন বলিয়াই আনন্দানুভূতি হইতেছে, সুতরাং তাঁহার জগৎ সম্পর্ক ঘুচে নাই; সে কারণ তাঁহার গুরুশুশ্রূষা সম্যক্‌ভাবে হইতেছে না, এবং শুশ্রূষা সম্যক্‌ভাবে হইলে, একমাত্র ব্রহ্মভাবই প্রবল থাকে, তখন আনন্দশূন্য জাগতিকভাব নাই, সুতরাং ব্রহ্মভাবে শান্তির অনুভূতি হয়। কিন্নরের ফলকামনার সহিত সাধন হইতেছে বলিয়া, সে ব্রহ্মসাধনার ফল পাইতেছে না, অর্থাৎ ফলকামনা বর্জ্জিত হইলেই ব্রহ্মলাভ স্বতঃই হয়। (৫১ শ্লোক দেখ)। গন্ধর্ব্বগণ বীণাযন্ত্র বাদনে এবং ওঁকারধ্বনি শ্রবণে রত থাকে। (ওঁকাররূপ বীণাযন্ত্রে শর যোজনা করিয়া ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপে সে ধ্বনি হয়। যথা ধ্যান বিন্দূপনিষৎ - প্রণবো ধনুঃ শরোহহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে), সে কারণ তাঁহাদের প্রকৃত গুরুসেবা হয় না, ধ্বনিতে লক্ষ্য না রাখিয়া গুরুধ্যানে

রত থাকিলে তবে প্রকৃত গুরুসেবা হয়(ওঁকার গীতা ৩২, ৩৩ শ্লোক দেখ)। পিতৃগণের গুরুর সূক্ষ্মমূর্তির অবগতি নাই বলিয়া, তাঁহাদের চন্দ্রলোকে বসতি হয়, এবং সূর্য্যলোকে গতি নাই বলিয়া, তাঁহাদের প্রকৃত গুরুসেবা হয় না। যক্ষগণ জগতের ঐশ্বর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গুরুসেবা করে বলিয়া তাঁহাদের গুরুসেবা হয় না। চারণগণের বাহ্যভাবে জপ ও স্তুতি পাঠ হয় বলিয়া, উহাদের অধম পূজক বলে এবং উহারা প্রকৃত প্রস্তাবে গুরু সেবক নহে, পরন্তু জপ ও স্তুতিপাঠব্রতী। মুনিগণ বাহ্যচিন্তা রোধের দ্বারা মৌনাবলম্বনে থাকেন বলিয়া, তাঁহারাও প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়েন নাই, কারণ ব্রহ্মভাবাপন্ন হইলে রোধের আবশ্যকতা কেন হইবে? যাঁহারা ব্রহ্মভাবাপন্ন তাঁহারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মই দেখিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট অবস্থাচ্যুতির কারণ স্বরূপ কিছুই নাই। (গীতা ১১শ অঃ, ২২ ও ৪৮ শ্লোক দেখ)।। ৫৪ *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (৩৭)

শ্রীশ্রীবাবার অলৌকিক শক্তির ব্যাপারে আশীষদার (আশীষ ব্যানার্জী) নিকট হতে শোনা আরও একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। আশীষদা বললেন — ''আমাদের দাদার (শ্রীশ্রীবাবা) হঠাৎ ইচ্ছা হল দিল্লী যাবেন বিশেষ কোনও কারণের জন্যে। যাই হোক, দিল্লী যাওয়ার দিন এসে গেল নির্দিষ্ট দিনে সম্ভবতঃ পূর্বা এক্সপ্রেসে সন্ধ্যাবেলা। আমি দাদাকে বললাম যে অফিস থেকে একটু আগে বেরিয়ে আপনাকে ট্রেনে তুলে দিতে যাবো। কিন্তু দাদা কিছুতেই রাজী হলেন না। অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও দাদাকে রাজী করানো গেল না। তবুও নির্দিষ্ট দিনে অফিস থেকে একটু আগে বেরিয়ে আমি দাদার অমতেই সময় মত হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। সেই সময় ক'দিনের জন্য দাদার দোক্তা (খৈনি) খাওয়ার সখ হয়েছিল। সেইকথা ভেবে আমি ভালো দোক্তার ডিবে কিনে তাতে দোক্তা এবং চুন পুরে নিয়ে গেলাম। কিন্তু অবাক কাণ্ড, নির্দিষ্ট সময় বিশেষ প্ল্যাটফর্মেতে ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু যে নামের লিস্ট আটকানো ছিল তাতে তন্নতন্ন করে খোঁজ করেও কোথাও দাদার নাম এবং সিট্ নম্বর দেখা গেল না। দাদার সাথে যে ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন তাঁরও নাম এবং সিট্ নম্বর দেখতে পেলাম না। অগত্যা হতাশ হয়ে

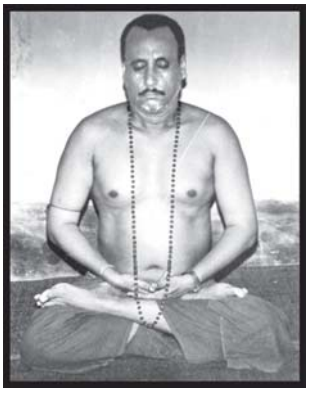

এবং খুব অভিমান ভরে বাড়ি ফিরে এলাম। নির্দিষ্ট দিনে দাদা ফিরে এলে পরের দিন দেখা করতে গেলাম। আমাকে দেখা মাত্রই দাদা খুব উৎসাহ ভরে বলে উঠলেন, ''আশীষ দোক্তাটা (খৈনি) দে, ওটা খাবার জন্যে মন বড় আনচান করছে।'' আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে দাদার পায়ের কাছে বসে পড়লাম।

প্রসঙ্গ (৩৮)

আমাদের (আশীষ ব্যানার্জী) বাড়ীতে কোনও একদিন ছোট ভেটকি মাছের কারি হচ্ছিল। হঠাৎ মনে পড়লো যে দাদা ছোট ভেটকি মাছের তরকারি খেতে ভালোবাসেন। সেই অনুযায়ী একটি ছোট গোটা ভেটকি মাছের কারি টিফিন কৌটোতে ভরে দাদার (শ্রীশ্রীবাবার) বাড়ী গিয়ে বৌদির কাছে দেতলায় রান্নাঘরে রেখে এলাম। এরপর দাদা যথারীতি যখন মধ্যাহ্নভোজনে বসেছেন, তখন, বৌদির অনেক বলা সত্ত্বেও বৌদির দেওয়া মাছের তরকারি কিছুতেই খেতে চাইলেন না। অবশেষে বলে উঠলেন যে, ''আশীষ যে ভেটকি মাছের পর্বটা আমার জন্যে এনেছে, সেটা আমাকে দাও'' এবং তখন দাদা আনন্দের সাথে সেটা খেলেন।

এখানেই বোঝা গেল ভক্তের প্রতি ভগবানের ভালোবাসা।

প্রসঙ্গ (৩৯)

গুরুমহারাজ ঢাকীকে ঋণমুক্ত করে গেলেন—

আমাদের আশ্রমে (অখণ্ড মহাপীঠ) যেমন দুর্গাপূজা হয় ঠিক তেমনি বাবার বাড়ীতেও দুর্গাপূজা হোত। কোন একবার

দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে দাদা অংশুমানকে দিয়ে ঢাকীকে বায়না করার জন্যে অগ্রিম ১০০ টাকা পাঠিয়ে দিলেন। সম্ভবতঃ এই ঢাকীর ডোমজুড় বা বড়গাছিয়ার দিকে বাড়ী ছিল এবং সে-ই প্রত্যেক বছর দুর্গাপূজাতে ঢাক বাজাতো। হঠাৎ দু-একদিন বাদে দাদা অংশুমানকে ওই ঢাকীর কাছে পাঠালেন অগ্রিম ১০০ টাকাটা ফেরৎ নিয়ে আসার জন্যে। অংশুমান এর কোনো কারণ খুঁজে পেল না এবং দাদার আদেশ অনুযায়ী অগত্যা ঢাকীর কাছে গেল এবং টাকাও ফেরৎ নিয়ে এলো। কিন্তু এর মধ্যেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। উদয়নারায়ণ জংশন, বড় গাছিয়া, ডোমজুড় এবং মাকড়দহের মানুষজনকে হাওড়ার দিকে আসতে গেলে দাসনগর রেল স্টেশন পার করে যেতে হয় এবং দাসনগর রেল স্টেশনের যে ওভার-ব্রীজ আছে তার তলা দিয়ে সমস্ত যানবাহনকে পেরিয়ে যেতে হয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে লোকভর্তি দূর পাল্লার বাসের মাথাতেও অনেক লোক বসে যায় কিন্তু এখানে এক সমস্যা হল যে কেউ যদি বাসের মাথাতে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে রেল ব্রীজের তলার অংশ দিয়ে তার মাথায় সজোরে আঘাত লেগে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অনিবার্য্য; সাবধান করা সত্ত্বেও এরকম ঘটনা বহুবার ঘটেছে। আমাদের ঢাকীটি কোনও কারণে হাওড়ায় আসতে গিয়ে ঠিক এই রকমভাবেই মাথায় আঘাত লেগে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় দুর্গাপূজার ঠিক দিন দুয়েক আগে। আমাদের 'দাদা' আগেই জানতে পেরেছিলেন বলে এ জন্মের জন্যে ঢাকীকে ১০০ টাকা থেকে ঋণমুক্ত করে গেলেন (আশীষদা থাকাকালীন এই ঘটনা ঘটেছে)।

প্রসঙ্গ (৪০)

শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে শ্রীশ্রীবাবা —

শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবের সঙ্গে আমাদের শ্রীশ্রীবাবার খুব হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। শ্রীশ্রীবাবা বলতেন যে অনেকদিনই তিনি শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেছেন। একবার ওনারা দুইজনে গঙ্গাসাগরে গিয়েছিলেন। গঙ্গাসাগরে দুইজনে গঙ্গায় স্নান করাকালীন একবার শ্রীশ্রীবাবা হঠাৎ দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবের কৌপীন বস্ত্রটি গাত্র হতে খুলে ফেলে দিয়ে সেটি জলের মধ্যে দূরে নিক্ষেপ করেন। এতে পরমহংসদেব কোনরূপ বিচলিত না হয়ে সাঁতার কেটে তখনই জলমধ্য হতে আপন কৌপীনটি নিমেষে উদ্ধার করে আনলে দুজনের মধ্যে হাস্য বিনিময় হল। তৎপরে আবার শ্রীশ্রীবাবা স্নান করতে করেতে তাঁকে বললেন, ''ওই দেখো! জলের স্রোতে সামনে একটা আম ভেসে যাচ্ছে; সেটি ধরতো।'' পরমহংসদেব সত্যই গঙ্গার প্রবল জলধারার মধ্যে একটি পরিপক্ক আম ভেসে যেতে দেখলেন। স্মিতহাস্যে তিনি সেই আমটিকে বারংবার ধরার চেষ্টা করে কৃতকার্য্য হলেন না। তিনি দেখলেন ফলটি স্রোতের ধারায় একই জায়গায় যেন ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু পরমহংসদেব বহু চেষ্টায়ও সেই ফলটি যখন ধরতে পারলেন না তখন তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বন্ধুর কাছে হার স্বীকার করলেন এবং ভীষণ খুশী হয়ে মহানন্দে তখনই শ্রীশ্রীবাবাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন —''সাবাশ!'' তৎপরে আবার দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা বিনিময় করলেন। ওদিকে ফলটি গঙ্গার জলেই অন্তর্হিত হল, তা আর কারোরই খেয়াল হল না। এক্ষেত্রে পরমহংসদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্রীশ্রীবাবা তাঁর নিজের যোগৈশ্বর্য্যবলেই এই লীলাটি সংঘটন করেন। শ্রীশ্রীবাবা পূর্ণসিদ্ধ ও আপ্তকাম হয়েছেন জেনে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব অভূত আনন্দ পান। এরপর স্নান করে দুজনে আপন গন্তব্যে প্রত্যাগমন করলেন। এই ঘটনার পর থেকে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক আরও প্রেমসিক্ত হয়ে উঠল। এই ভাবেই শ্রীশ্রীসরোজ বাবা মহাত্মাদের সঙ্গে রসরঙ্গে লীলা করতেন।

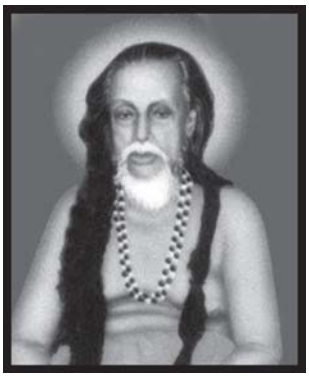
শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেব

এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য যে শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবের নিকট শ্রীশ্রীবাবা অনেক পূর্ব থেকেই যাতায়াত করতেন। প্রকৃত সৎসঙ্গ করার জন্যে। পরমহংসদেব শ্রীশ্রীবাবার থেকে বয়সে অনেকটাই বড় ছিলেন। যখন শ্রীশ্রীবাবা তাঁর সান্নিধ্য প্রথম লাভ করেন তখন শ্রীশ্রীবাবা সিদ্ধ ছিলেন না। পরে লোকালয় হতে হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে হিমালয়ের ব্যাসপীঠে যান। চোদ্দ বৎসর পরে আবার হঠাৎই একদা গুরু নির্দেশে তিনি কিছু সময়ের জন্যে লোকালয়ে ফিরে আসেন। সেই সময়ই এই লীলা সংঘটিত হয়। ওই অদ্ভুত আশ্চর্য্য লীলার মাধ্যমে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনিও 'পরমহংস' হয়েছেন। এই ঘটনার মাধ্যমে একজন পরমহংস অরেকজন পরমহংসকে চিনতে পারলেন। এই বিষয়টি জেনেই

শ্রীদুর্গাপ্রসন্নদেব পরমানন্দিত হন কারণ তিনি মনে প্রাণে কামনা করতেন যে শ্রীশ্রীবাবা যেন আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি পূর্বে শ্রীশ্রীবাবাকে বলেছিলেন যে তিনি শ্রীশ্রীবাবার সদ্‌গুরু নন; সময়ে শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে তাঁর সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ হবে। শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবের কথা শ্রীশ্রীবাবার জীবনে সত্য হয়েছিল।

উপরিউক্ত এই ঘটনা আমি শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর নিকট শ্রুত হই। শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীবাবার অতুল যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে অবগত হন এবং এইরকম বহু ঘটনা শ্রীশ্রীবাবা শ্রীশ্রীমাকে বলেছেন। *.....ক্রমশঃ*

—পিতৃচরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া

নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(৩১)

রামকৃষ্ণদেব - ''ওসব জানিস, মনের কালিমা, মা কালীকে পুজো করলে ঐ সব মনের কালিমা দূর হয়ে যায়; অন্য দেবতাকে পুজো করলেও, মা কালীই গিয়ে, মনের জঞ্জাল সরিয়ে দেবে; যে দেবতার যা কাজ, সেই দেব-দেবীই সেই সব কাজের জন্য নিযুক্ত হয়ে যায়, যে কোন দেবতারই পুজো করনা কেন অন্য দেবতাও তোর সহায় হয়ে দাঁড়াবে। বাড়ীর যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করলে, কর্ত্তা বা গিন্নীর যেমন খবর দিতে পারে, দেব দেবীদের বেলায়ও তাই। যে কোন এক দেব বা দেবী মূর্ত্তির সাহায্য নিলেই বা তাঁর নাম বা মন্ত্রের পূজা করলেই, তিনিই আবার অন্য দেব-দেবীর কাছে নিয়ে যাবেন। মনের মাঝে একজনকে আসন দিলেই অন্য আসন আপনি আসবে, আকাশের দিকে আয়না ফেললে কি শুধু চাঁদই দেখা যায়? তার সঙ্গে সঙ্গে তারাগুলোও কি এসে পড়ে না? তাই বলছি মনের মাঝে ঝগড়া রাখিস না। যাঁর মন্ত্র মনে আসে, তাঁর মন্ত্রই জপ করবি জানিস মনই ভগবান।''

বিবেকানন্দ জিজ্ঞাসু হয়ে উত্তর দিলেন, ''মনই যদি ভগবান তবে দ্বিধা সঙ্কোচ বা বিচার ভেদ আসে কেন?''

রামকৃষ্ণদেব -''তাতো আসবেই, মায়ের কাছে গেলে অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত দেবতা, কোটি কোটি রকমের আশা, আনন্দ, প্রেম, ভক্তি, শক্তি ও মুক্তির দুয়ার খুলে যায়, যার যেটা দরকার বা সেই সময়ের যোগাযোগ দিতে হবে, তারই নির্দ্দেশ লক্ষণগুলো ছড়িয়ে পড়ে আর, তারই মধ্যে একটা বাছাই হয়ে তার মনের মাঝে জোগান পড়ে। মনে কর তুই এক রথের মেলায় হাজির হয়েছিস; সেখানে তো সব রকম দোকানই আছে, কিন্তু কেউ কিনছে তেলেভাজা আবার কেউ কিনছে ঘিয়েভাজা। যার যা পেটে সইবে, সে সেই জিনিসই বেছে নেবে; অন্য জিনিস নেবে কেন?''

বিবেকানন্দ - ''মাঝে মাঝে মনের তোলপাড় আসে - কেন আপনার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে? - এই আকর্ষণ কি আপনার দ্বারা হয়েছে? না আমার জন্য হয়েছে? আপনার জন্য এমন কি দিনান্তে একবারও আপনার দর্শন না -পেলে সেই দিনটা যেন ব্যর্থ হয়ে যায়, সংসারের এত অভাব, অনটন তবু তার দিকে যেন মনের প্রভাব কার্য্যকরী হয় না, সেদিকের এক বিরাট কর্তব্য ত্যাগ করে, শুধু আপনার কাছে বসে থাকাও কি পাপ নয়? কেন আমার এই বিরাট কর্মে বাধা এসে এক অনিশ্চিৎ সংসারের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি? মনের এই যে এক বিষম দুর্বলতা - এও কি এক মায়া-মরীচিকা বা ভ্রান্তি নয়? তবু আপনাকে দেখলে মনে হয় —

ভাঙা ঘর ওসব ভেঙে ফেলেদে,
স্বর্গ সোপান গড়িয়া তোল-
ওরে ভাঙরে কারা, পাষাণ ঘেরা
মা! মা! বলে সবে, তোল কলরোল''—

গানের সুরে বিবেকানন্দের সব অঙ্গ ধুয়ে যেতেই চোখের জলে সর্ব অঙ্গ ধুয়ে যেতে লাগল চোখ দুটো যেন রাঙাজবাতে বর্ষার ধারা নামল গণ্ডদুটির দুকুল ছেপে, সুরধনী যেন বুকে নেমে, পা দুখানি ধুয়ে দিতে লাগল —

রামকৃষ্ণদেবও চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলে উঠলেন, '' মা! তুই একী করলি? নরেনকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? ওকে নতুন কাপড় পরিয়ে আমারই কাছে ফিরিয়ে দে মা! আমারই কাছে ফিরিয়ে দে।''

ঠিক এই সময় আরতি ঘন্টা বাজিয়ে, কে যেন ভক্তি গদ-গদ কণ্ঠে গেয়ে উঠল —

'জয় জয় রাম! জয় জয় কৃষ্ণ
রা-ম কৃষ্ণ, কর সার—
জয় জয় সীতা! জয় জয় রাধা
রাম কৃষ্ণ প্রভো, তুমি পারাবার। *...ক্রমশঃ*

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং (৬)

ওঁ

প্রণবাশ্রম, কাশীধাম
১৩ ই মাঘ, ১৩৪৫ বাং

শ্রীমান রাজা - পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। মুক্তাত্মার চরম অবস্থা কিরূপ, তুমি প্রশ্ন করিয়াছ, তদুত্তরে লিখিতেছি। যথা —

শ্রুতিতে উক্তি আছে, 'ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মৈব ভবতি।' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হয়েন। অগ্রে জীব জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েন, পরে ব্রহ্ম হয়েন। প্রথম উদ্রেকে, তিনি ব্রহ্মকে জানেন বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলা হয়। পরে ঐ, জ্ঞানের ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধি হইতে থাকে। অবিদ্যা জীবকে আবৃত রাখায় জীব আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝেন না। তাঁহার স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম-দেহের উপর আমি, আমার ইত্যাদি অভিমান থাকায় সুখ ও দুঃখের জ্ঞাতা হইয়া আপনাকে সুখী ও দুঃখী বলিয়া বোধ করেন। আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া তিনি সুখে বা দুঃখে অভিভূত হয়েন না। আত্ম প্রভাবে তাঁহার রাগ-দ্বেষাদি তিরোহিত হয় এবং অন্তরস্থ রিপুগণ বশীভূত হয়েন। তাঁহার কামনা, বাসনা, সঙ্কল্পাদি তিরোহিত হয়। তখন তিনি অতি নির্মল, স্থির, ধীর, শান্ত ও সমভাব ধারণ করেন। এই অবস্থাপন্ন হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলা হয়। তবে কখন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়? এই সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন - যথা, 'যদা অসৎ সর্ব্বং আত্মৈব ভবেৎ, কিং কেন পশ্যেত, কিং কেন জিঘেৎ, কিং কেন স্পর্শেৎ, কিং কেন শৃনুয়াৎ, কিং কেন মন্বেত। যেন সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাত তং কেন বিজানীয়াৎ। বিজ্ঞাতারং আর কেন বিজানীয়াৎ।' ইহার অর্থ এই - যখন সমস্তই (সমগ্র জগৎই) তাঁহার নিকট আত্মারূপে প্রতিভাত হয়, তখন কাহার দ্বারা তিনি কাহাকে দেখিবেন, কাহাকে আঘ্রাণ করিবেন, কাহাকে স্পর্শ করিবেন, কাহাকে শ্রবণ করিবেন, কাহাকে মনন করিবেন? যিনি সমস্তকে জানিতেছেন (তিনিই আত্মা) তাঁহাকে কাহার দ্বারা জানিবেন? যিনি এই সমস্তের বিজ্ঞাতা তাঁহাকে আবার কাহার দ্বারা জানিবেন? জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই তিনি। এখানে শ্রুতির মর্ম্ম এই - তিনি সমগ্র জগৎকে আত্মময় দেখেন জড়বস্তু বলিয়া তাঁহার নিকট স্বতন্ত্র কিছু থাকে না। তিনি তখন সমগ্র জগৎকে 'আমি' বলিয়া জানেন। তখন সর্বত্র সর্বাবস্থাতে ও সর্বকালেই জ্ঞান প্রতিভাত হয়।

'অভেদো ভাসতে নিত্যং বস্তুভেদো ন ভাসতে।' অর্থাৎ, তখন অভেদ ভাবই উদ্ভাসিত হয়, বস্তুভেদ থাকে না। তখন কি তিনি জগৎ দর্শন করেন না? ইহার উত্তর এই - এক্ষণে জগৎ-দর্শন করিতেছেন, পরক্ষণেই আর জগৎ নাই। এই দেখিতেছেন স্থূল-সূক্ষ্মদেহ আছে, পরক্ষণেই আর দেখেন না। তাহার কার্য্য করিতে অনিচ্ছা নাই, নিবৃত্তিরও ইচ্ছা নাই। যখন তিনি কার্য্য না করেন, তখন তিনি যেমন পরমাত্মা, যখন কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন, তখনও তিনি সেইরূপ পরমাত্মা। তিনি অরণ্যে বা গিরিগুহাতে থাকেন বা গৃহে থাকেন তিনি সমভাবে সর্বত্রই পরমাত্মা। একমেবাদ্বিতীয়ং। তখন তিনি ব্রহ্মই হয়েন। দেহান্ত পর্যন্ত তাঁহারও কর্মফল ভোগ থাকে। তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে ভোগ করেন। দেহান্তকালে তাঁহার সর্ব কর্মফলের অন্ত হয়। প্রারব্ধ কর্মফলের অন্ত ভোগের দ্বারা হয় এবং সঞ্চিত কর্মের নাশ জ্ঞানের দ্বারা হয়। অবিদ্যা নাশ হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ লেশ অবশিষ্ট থাকে। তদ্বারা প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ হয়। দেহান্তকালে তাহাও বিনষ্ট হয়। তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মভাবে অবস্থান করেন। দেহ থাকিতে তাহাকে জীবন্মুক্ত বলে, দেহান্তে তাহাকে নির্বাণ বা কৈবল্য-প্রাপ্ত বলে। কারণ, দেহ থাকিতে সামান্য অবিদ্যার লেশ থাকিলেও অবিদ্যা নাশ প্রাপ্তা বলিয়া পরিগণিতা হয়েন। 'একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' অর্থাৎ, একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মই আছেন, নানা

বস্তু বলিয়া কিছু নাই। অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়। একমেবাদ্বিতীয়মিতি। দেহত্যাগের পূর্বে তাহার সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের উদয় না হইলেও দেহান্তে হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন - 'স স্বরাট ভবতি, অনন্যাধিপতি ভবতি।' অর্থাৎ, তাঁহার স্বকীয় রাজ্য স্থাপন হয়। তদুপরি কোনও অধিপতি থাকেন না। তিনি তখন নিজেই প্রধান। কাহারও নিকটে তাঁহার অধীনতা নাই। তাঁহার চিরসুখ চিরশান্তি ভোগ হইয়া থাকে। অতএব একমেবাদ্বিতীয়মিতি।

ইতি—

শ্রীকিশোরী মোহন

উপরের পত্রের সঙ্গে নিম্নের পত্র আসে—

ওঁ

১৩ ই মাঘ, ১৩৪৫ বাং

(৬) ১। শ্রীমান রাজা - পরম কল্যাণীয়েষু,

অতি সংক্ষেপে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। ইহা হইতে বুঝিয়া লও। অবিদ্যাকে বিশ্বাস নাই। ইহার অনুমাত্রও লুক্কায়িত থাকিলে তাহা হইতে পুনরায় অবিদ্যাবৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। এজন্য দেহান্ত পর্যন্ত সাধন করিতে হয়। 'আপ্রয়ানাৎ তথাহি দৃষ্টং।' আমার ও শ্রীমান রুদ্রের শরীর একরূপ আছে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে ও শ্রীমান অমরেন্দ্রকে, শ্রীমান ক্ষিতীশ চন্দ্র সেনকে ও শ্রীমান ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরীকে আমার আশীর্বাদ দিবে। তোমরা একত্র উপবিষ্ট হইয়া তত্ত্বালোচনা কর এবং আনন্দ ভোগ কর। সদা অদ্বৈত ভাবনা লইয়া থাক। বৈষয়িক সর্বকার্য্য মধ্যেও নিজের অদ্বৈত ভাব বিস্মৃত হইবে না। একমেবাদ্বিতীয়মিতি।

ইতি-

শ্রীকিশোরী মোহন

(*'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত*)

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ৩৯ : 'গায়ত্রী' মন্ত্রের অর্থ কি? 'গায়ত্রী' দেবী আর 'গায়ত্রী' মন্ত্র দুই-ই কি এক?

উত্তর : গায়ত্রী ঋগ্বেদের পবিত্রতম মন্ত্র। গায়ত্রী দ্বিজগণের উপাস্য সিদ্ধ-চিন্ময় মন্ত্র বিশেষ। প্রত্যেক সদাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যকে মনে মনে ধ্যান করিতে হয়। প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি হল —

'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।'-(ঋগ্বেদ, ৩য় মণ্ডল, ৫ম অধ্যায়, ৬২ সূক্ত)

এই মন্ত্রগুলি সাবিত্রীর (সূর্য্য) উদ্দেশ্যে লিখিত। গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ — 'সর্বলোক প্রকাশক সর্বব্যাপী সেই পূর্ণমণ্ডল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করছেন। দেবীরূপে এই সবিতা ব্রহ্মার স্ত্রী এবং চতুর্বেদের মাতা।'

লিঙ্গ পুরাণে আছে — শ্বেতকল্পে মহাদেব হইতে শ্বেতবর্ণা গায়ত্রী দেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। আবার মৎস পুরাণে আছে — মহাপ্রজাপতি ব্রহ্মা একদা জপে নিরত ছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পবিত্র দেহ ভেদ করিয়া অর্দ্ধ স্ত্রীরূপ ও অর্দ্ধ পুরুষরূপ প্রাদুর্ভূত হইল। এই স্ত্রীরূপার্দ্ধ 'শতরূপা' নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। এই শতরূপাই সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী ও ব্রহ্মাণী নামে বিখ্যাতা হন। দেবী সরস্বতী, যিনি মহাসরস্বতী রূপ দুর্গাদেবীর অংশ সম্ভূতা, তিনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পত্নী ও বেদমাতা গায়ত্রী ব্রহ্মার কনিষ্ঠা স্ত্রী।

গায়ত্রী মন্ত্র চিন্ময়; গায়ত্রী মন্ত্রই গায়ত্রী দেবীর পূজিত তত্ত্বরূপ। গায়ত্রী পাঠে মানুষ ত্রাণ পায়। গায়ত্রীর শক্তিতে বিশ্বামিত্র ঋষি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। যাঁহারা এই মন্ত্র পাঠ বা গান করেন তাঁহারা ত্রাণপ্রাপ্ত হন বলিয়া এই মন্ত্রটির নাম 'গায়ত্রী'। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ বেদ-পারদর্শী আচার্য্যের কাছে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হন; তখন তাহাদের পুনর্জন্ম হয় এবং তখন তাহারা দ্বিজ বলে অভিহিত হন। গায়ত্রী মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যায় পবিত্রভাবে জপ করে উপাসনা করিতে হয়। গায়ত্রী একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও তিন বেদ। গায়ত্রী গীতকারীদিগকে ত্রাণ করেন বলিয়া 'গায়ত্রী', নামে অভিহিতা হন। ক্রিয়াযোগ সাধনায় গায়ত্রী-মন্ত্র ন্যাস প্রাণায়াম সহযোগে করিতে হয়। শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ গিরি মহারাজ লিখিত 'সপ্তশ্লোকী' প্রণব-গীতায় ইহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীতে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী শক্তির আরাধনা করা হইয়া থাকে। ঐ তিন দৈবী শক্তির প্রত্যেকটির আলাদা তত্ত্ব রহিয়াছে। ঐ তিন শক্তিতত্ত্বের সমন্বয়ের পূর্ণজ্ঞানরূপা হইলেন দেবী গায়ত্রী। **—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী**

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা

(৫)

শ্রীশ্রীবদ্রীবিশালজীর শ্রীচরণে আমাদের পৌঁছানোর দিনটি ছিল ইং ১৯শে সেপ্টেম্বর, বুধবার, ২০১২ সাল। বর্ষার প্রকোপ তৎসহ পাহাড়ী অঞ্চলের দুর্যোগের বার্তা থাকলেও শ্রীশ্রীমায়ের অপার কৃপায় সেইদিন সকাল থেকেই আকাশ অনেকটাই ছিল পরিষ্কার। গাড়ীর চালক আমাদের মালপত্রগুলি গাড়ীর মাথায় ও পিছনে ভালভাবে বেঁধে নিয়ে শুভ তীর্থযাত্রা শুরু করেছিল শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ নিয়ে স্বর্গরাজ্য হিমালয়ের পথে। স্বর্গদ্বার হরিদ্বার থেকে রওনা হয়ে হৃষীকেশধাম স্পর্শ করে আমরা এগিয়ে চলতে থাকি 'পঞ্চপ্রয়াগের' পথে। 'প্রয়াগ' কথার অর্থ হচ্ছে একাধিক স্বর্গীয় নদীর সঙ্গমস্থল, যা হিন্দু সমাজে তীর্থস্থান বলেই গণ্য হয়ে থাকে। আমরা বইতে পড়ে থাকি এই পথে প্রথমে পড়বে দেবপ্রয়াগ, তারপর রুদ্রপ্রয়াগ, এরপর কর্ণপ্রয়াগ, তারও পরে নন্দপ্রয়াগ ও সর্বশেষে বিষ্ণুপ্রয়াগ। এই তীর্থপথে আছে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেমন - যোশীমঠ, চামৌলী, শ্রীনগর, পাণ্ডুকেশ্বর, হনুমানচটি ইত্যাদি। এইসব কিছুই দেখতে পাব ও জীবনে প্রথম হিমাদ্রিপতিকে কাছ থেকে দর্শন করতে পৌঁছাবো সেই ১০,৩৫০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ব্যাসতীর্থ শ্রীশ্রীবদ্রীনাথধামে, তাই মনের ভিতর আড়াল হয়ে থাকা দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত আনন্দের ছোঁয়া এই পথ যাত্রায় বেরিয়ে আসতে থাকে বিভিন্ন ধরণের সৌন্দর্য্যপূর্ণ দৃশ্যগুলি দেখার সময়। গাড়ীতে বসে ভাবছিলাম, এই তো সবে শুরু স্বর্গারোহণের পথে যাত্রা, সুন্দর থেকে সুন্দরতম প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য কত যে চোখে পড়ছে এবং আরও কত যে পড়বে তারই আনন্দে ছিলাম মাতোয়ারা হয়ে। না ছিল মনে কোন ভীতি, না ছিল চিন্তার কোন অবকাশ, নিশ্চিন্ত মনেই চলেছিলাম নগাধিরাজকে পরিক্রমা করতে করতে; নীলকণ্ঠ পর্বতের গা লাগোয়া নর-নারায়ণ পর্বতের চরণতলে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে। যেখানে তীর্থযাত্রার পথের সাথী মাতা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী আছেন, সেখানে অতি বড় বাধাও থমকে দাঁড়ায় তা জগতের প্রায় সকল মানুষেরই জানা। প্রকৃতি প্রবল বেগে ধেয়ে আসলেও পরমা প্রকৃতির সম্মুখে এসে মাথা নত করে দাঁড়াতে বাধ্য হন। জগতের মানুষের মধ্যে যখন বিভিন্ন ধরণের অপকর্ম প্রবেশ করে এই ভূখণ্ড পাপে জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে তখন, পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতির অখণ্ড সদ্‌ইচ্ছায় এবং নবজাগরণের উৎস সন্ধানের উদ্দেশ্যে, প্রকৃতির দ্বারাই খণ্ড-প্রলয় বা মহাপ্রলয় হয়ে থাকে। আমরা চলেছিলাম পরমাপ্রকৃতি ভগবতীর এক সংকল্প সাধনের পরিকল্পনা সফল করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরই সাথে শ্রীশ্রীবদ্রীনাথধামে। আমাদের গাড়ী হৃষীকেশ থেকে হিমালয় পর্বতের ৭০ কি.মি. ওপরে উঠে আসতেই পড়েছিল প্রথম প্রয়াগক্ষেত্র যা 'দেবপ্রয়াগ' নামেই খ্যাত। সেখানে মিলিত হয়েছে স্বর্গগঙ্গার দুই ধারা, একটির নাম ভাগীরথী ও অপরটির নাম অলকানন্দা। জানতে পারি যে, এই স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দা শ্রীশ্রীবদ্রীনাথের চরণ ছুঁয়ে ধেয়ে এসে এক আনন্দধারায় সেখানে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত ধারা দেবপ্রয়াগ হতে 'গঙ্গা' নামে মর্ত্যে অবতরণ করেছে, যার পরবর্তী সঙ্গমস্থল এলাহাবাদের প্রয়াগ ও শেষে পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাসাগরে। দেবপ্রয়াগ ঐশ্বর্যে ভরা প্রকৃতির কোলে দেবতাদের যজ্ঞভূমি বলেই পরিচিত। কথিত আছে, পঞ্চপ্রয়াগের মধ্যে দেবপ্রয়াগই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। পৌরাণিক যুগে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাজী সেখানে একটি যজ্ঞ করেছিলেন। সেখানে গঙ্গার তীরে আছে এক যজ্ঞবেদী আর তার পাশে আছে ছোট জলাশয় যা 'হোলকুণ্ড' নামে বিখ্যাত। এটি তীর্থযাত্রীদের দর্শনীয় স্থান, এছাড়া আচার্য্য শঙ্কর তীর্থ পরিক্রমা করাকালীন তিনি এই সঙ্গমস্থল দেবপ্রয়াগে গিয়েছিলেন। তীর্থ কৃত্যাদি শেষ করে তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করেছিলেন পঞ্চপ্রয়াগের প্রথম প্রয়াগতীর্থ দেবপ্রয়াগে। চলন্ত গাড়ী থেকে যতদূর দৃষ্টি গিয়েছিল তাতে দেখতে পেয়েছিলাম পাহাড়ের উপর রয়েছে ছোট শহর। দিয়াশলাই-এর বাক্সের

দেবপ্রয়াগ

মতন ঘর বাড়ীগুলি চোখে পড়তে থাকে। চলাচলের জন্য রয়েছে পাহাড়ের উপর তৈরী পথ ও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা, তাও দৃষ্টিগোচর হয় এবং সেখানে সঙ্গমস্থলের পাশে পাহাড় ও দুই নদীর মিলনক্ষেত্রের শোভা অতি অপূর্ব নয়নাভিরাম।

আমাদের গাড়ী পাহাড়ের উপর দিয়ে ছুটে চলেছিল ঊর্দ্ধগতিতে পাকদণ্ডী বেয়ে দ্বিতীয়তম প্রয়াগক্ষেত্র 'রুদ্রপ্রয়াগের' দিকে। এই পথে কিছু ধর্মীয় স্থান আছে যার মধ্যে প্রথমে পড়েছিল রাণীবাগ ও তারপর শ্রীনগর। পুরাণ বা ঐতিহাসিক কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাণীবাগ হতে শ্রীনগর যাওয়ার পথে একটি গ্রাম আছে সেখানে আছে জনক রাজার একটি প্রাচীন আশ্রম। তিনি সেখানে দীর্ঘদিন তপস্যা করেছিলেন, যার প্রমাণ স্বরূপ তপোস্থলীতে কিছু নিদর্শন আজও রয়েছে। অলকানন্দার তীরে তীরে সমগ্র পাহাড়ীক্ষেত্রের নয়ন আকর্ষক সৌন্দর্য্য ও নদীর প্রবাহিত ধারার হেলদোল খেলা দেখতে দেখতে আমাদের বাহক উঠে আসতে থাকে বেশ আনন্দেই। দেবপ্রয়াগ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ প্রায় ৭০ কি.মি. পথ অর্থাৎ হৃষীকেশ থেকে দূরত্ব প্রায় ১৪০ কি.মি.। সেই পথে একস্থানে গাড়ী দাঁড় করিয়ে গাড়ীর চালক ও আমরা সকলে কিছু খাবার ও চা গ্রহণ করি। তারপরেই আবার যাত্রা শুরু করে উঠে আসতে থাকি রুদ্রপ্রয়াগের কাছে। পথে পড়েছিল বেশ কিছু স্থান চড়াই, আবার কিছুটা সমতল, তারপর অল্প উতরাই হয়ে আবার চড়াই, তাই গাড়ী যেন চলেছিল 'দোল দোল চর্তুদোলায় দোলে' এইরূপ ভঙ্গিমায়। আমরাও চলেছিলাম উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মগ্ন হয়ে। কবির ভাষায় - ''যেদিকে ফিরাই আঁখি, শ্যামল মূরতি দেখি;'' প্রকৃতি আমাদেরকে যেন আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল। দেখে মনে হয়েছিল চর্তুদিকেই পর্বতমালা, মধ্যমণি হয়ে চলেছে কণ্ঠহারসম কেবল শুধু পথটুকু। কিন্তু তা নয়, আরো কাছে আসতেই চোখে পড়েছিল তিন দিকেই পর্বতমালা পাহাড়ী গাছ গাছালির দ্বারা আবৃত, তার বুকের উপর দিয়ে চলেছে পথের রেখা, পথের সাথীদের নিয়ে সুদূর তীর্থপ্রান্তে। সেই পথের পাশে গভীর নীচ দিয়ে খরস্রোতা অলকানন্দা প্রবাহিতা, তার উত্তরেই রয়েছে প্রাচীন সঙ্গম। সেখানে স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে আরও একটি স্বর্গগঙ্গা যিনি গঙ্গোত্রী হিমবাহের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে, কেদারনাথ পর্বত থেকে নেমে, অপর দিক থেকে আসা চোরাবারি হিমবাহের সৃষ্টি কালীগঙ্গা, চোরাবারি তালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেখান থেকে মর্ত্যে অবতরণ করেন 'মন্দাকিণী' নামে। স্বর্গের আশীর্বাদপূত দুই গঙ্গা নদী অলকানন্দা ও মন্দাকিণীর এই সঙ্গমস্থলকেই 'রুদ্রপ্রয়াগ' বলা হয়ে থাকে। ছোটবেলা থেকে একটি সত্য কথা আমরা জানি হিমালয়েই রয়েছে শিবালয়। তাই এই ভ্রমণ পথের সঙ্গীদের মাধ্যমে জানতে পারি যে, পঞ্চপ্রয়াগে প্রথমতম প্রয়াগ দেবপ্রয়াগে রয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি শরণার্থে 'বাবা কমলেশ্বর' শিবের প্রাচীন মন্দির, আর দ্বিতীয়তম প্রয়াগ রুদ্রপ্রয়াগে রয়েছে 'বাবা রুদ্রনাথ বা রুদ্রেশ্বর' শিব মন্দির। এছাড়া এখান থেকেই শিবক্ষেত্র কেদারনাথজীর মন্দির যাওয়ার পথ শুরু, মন্দাকিণীর তীরে তীরে পাহাড়ী পথ ধরে উপরে উঠে চলেছে। রুদ্রপ্রয়াগ অঞ্চলই প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্র শিকারী জিম্ করবেটের স্মৃতি বিজড়িত স্থান।

আমরা রুদ্র প্রয়াগ ছাড়িয়ে উঠে চলেছিলাম তৃতীয়তম প্রয়াগক্ষেত্র 'কর্ণপ্রয়াগের' দিকে। এই পৃথিবীর বুকে অসংখ্য পর্বতমালা থাকলেও সু-শৃঙ্খল ও সৌন্দর্য্যবহুল তপোভূমি বলতে হিমালয় সর্বশ্রেষ্ঠ। যারফলে যুগ যুগ ধরে ব্রহ্মর্ষি থেকে আরম্ভ করে মহামুনি, মহাতপা, মহাবতার উপাধিধারী অতি শক্তিশালী তেজ সম্পন্ন মহাত্মাগণের আবাসভূমি ও তপোস্থলী এই হিমালয়েই রয়েছে। তার সাথে প্রাচীন মঠ, মন্দির ও সরোবর ছাড়াও সেখানে রয়েছে অনন্ত আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার, যা আহরণ করার জন্য সাধু-সন্ন্যাসীগণেরা সদা সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকেন। আমরা চলেছিলাম সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী জগৎ-মাতা ভগবতীর চিরআশ্রিত সঙ্গী হয়ে বদ্রীনাথধামে। সেখানে স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে পেণ্ডার নদী। যাকে অনেকে কর্ণগঙ্গা বলে অভিহিত করেছেন। সঙ্গমে এই নদী হিমালয়ের নন্দাদেবী পর্বতের গা বেয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, পেণ্ডার হিমবাহ হতে সৃষ্টি হয়ে। মহাকবি কালিদাসের লেখায় শতপন্ত হিমবাহ ও ভগীরথ হিমবাহের সাথে পেণ্ডার হিমবাহের যোগাযোগের কথা পাওয়া যায়। কর্ণপ্রয়াগের সঙ্গমস্থলও এক অপূর্ব দর্শনীয় স্থান। সকল তীর্থযাত্রীদের ক্ষেত্রে এটি মনোমুগ্ধকারী পাহাড়ীক্ষেত্র ও নদীদ্বয়ের মিলনতীর্থ, বড়ই আকর্ষণীয় হবে বলে মনে করি। সেখানে পাহাড়ের উপর জঙ্গলের পাশে বেশ কিছু ঘর-বাড়ী, মন্দিরের চূড়া দেখা গিয়েছিল। এটি রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ১৯ কি.মি. যেতেই পড়ে।

তবে হৃষীকেশ থেকে এই পথ প্রায় ১৬৯ কি.মি। আমাদের গাড়ী কখনও সমতল হয়ে চড়াই আবার কখনও শুধু চড়াই, এইভাবেই পাহাড়গুলিকে অতিক্রম করে এবং তার বিলাসবহুল সৌন্দর্য্যের রূপরেখাগুলিকে অভিনন্দন জানাতে জানাতে চলছিল। দ্বাপর যুগের মহাভারতের কাহিনী অনুসারে জানতে পারি যে, কুন্তীর পুত্র মহাবীর ও দাতা 'কর্ণ' এই প্রয়াগক্ষেত্রে এসে একদা তাঁর আত্মকর্মের উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন তপস্যা করেছিলেন এবং তাঁর পরমপিতা সূর্যদেবের আশীর্বাদে 'কবচ কুণ্ডল' লাভ করেছিলেন, যা ছিল মহাবীর কর্ণের অভেদ্য বর্ম ও কর্ণভূষণ। আরও জানা যায় যে, মাতা কুন্তী তাঁর এই পুত্রের জন্মদানের পরেই কর্ণচ্ছেদ করে স্বর্ণকুণ্ডল পরিয়ে দিয়েছিলেন স্মৃতিচিহ্ন রাখার জন্য। সেই থেকে তাঁর নাম হয়েছিল 'কর্ণ'। এই মহাবীর কর্ণই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষ থেকে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁরই নামকরণ অনুযায়ী সেই প্রয়াগের নাম হয়েছে 'কর্ণপ্রয়াগ'। একদা স্বামী বিবেকানন্দ সেই প্রয়াগতীর্থে একটানা ১৮ দিন বসে তপস্যা করেছিলেন। শোনা যায় যে, একটি মন্দির আছে যেখানে হিমালয়ের কন্যা উমাদেবীর ও মহাবীর কর্ণের বিগ্রহ রয়েছে, যা এখনও নিত্য পূজিত।

সেই প্রয়াগক্ষেত্রে আমাদের বাহক ছিল চলমান, আর পাহাড়ী পথে চালকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মতন আমাদের দৃষ্টি ছিল হিমালয়ের গিরিখাদ থেকে আরম্ভ করে প্রকৃতির অপরূপতার মাধুর্য্য থেকে পাওয়া এক অপার্থিব আনন্দের প্রতি। তা সত্যই ছিল মহা আনন্দের উপলব্ধি, যা দু-কলম লিখে পাঠকদের বোঝানো বড়ই মুশকিল। পথের দূরত্ব ছিল কর্ণ প্রয়াগ থেকে ২১ কি.মি, তাই দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে যাই 'নন্দপ্রয়াগে'। *...ক্রমশঃ*

—মাতৃচরণাশ্রিত স্বামী সংবেদানন্দজী

যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব

পঞ্চবিংশ পর্য্যায়—

শ্লোক :— *বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।*
কারিতাস্তে যতোহতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।। ৬৩

বাংলা শ্লোকার্থ :— বিষ্ণু, আমি ও ঈশান, সকলেই তোমার প্রভাবে শরীর ধারণ করেছি, তাই কে তোমার স্তব করবে?

যৌগিক ব্যাখ্যা :— ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সমষ্টিভূত পরমব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তিই জগদীশ্বরী। ইনিই ত্রিগুণময়ী ত্রিশক্তিরূপা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়কর্তৃ। আবার প্রতি জীবের অন্তরে ব্যষ্টি-চেতনায় মন, প্রাণ ও জ্ঞানরূপা। ঐ ব্যষ্টি মন-প্রাণ-জ্ঞান বিরাটের সমষ্টিগত মন-প্রাণ ও জ্ঞানের অংশবিশেষ। এই সমষ্টি মন-প্রাণ ও জ্ঞান ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে বিদিত। সুতরাং ব্যষ্টি মন, প্রাণ ও জ্ঞানের উপাসনা করলেই সমষ্টিরূপ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের তথা ত্রিগুণময়ী মহতী শক্তিরূপা বিশ্বমাতার পূজা করা হয়। ব্যষ্টি-চেতনাতে সাধক ক্রমশঃ সাধনমার্গের এমন পর্য্যায়ে উপনীত হন যে তখন সর্বত্রই অন্তরে বাহিরে মাতৃসত্তাকে অনুভব করে আত্মানুভূতিতে নিবিষ্ট হন।

শ্লোক :—
সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ।। ৬৪
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ।। ৬৫

শব্দার্থ :— ইত্থং - এইরূপ, সংস্তুতা - আরাধিতা হয়ে, মোহয় - মোহিত কর, দুরাধর্ষৌ - ভয়ঙ্কর, নীয়তাং - অনুপ্রাণিত কর, বোধঃ - প্রবৃত্তি।

বাংলা শ্লোকার্থ :— হে দেবী! তুমি এই প্রকারে নিজ দিব্য মহিমায় আরাধিতা হয়ে সেই দুর্জয় অসুরদ্বয় মধুকৈটভকে মুগ্ধ কর। তুমি শীঘ্র জগৎপ্রভু বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা থেকে জাগরিত করে এই মহা-অসুরদের বধ করার জন্য প্রেরণা দাও।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— সাধনরত যোগী অনুভব করেন যে মায়ের দিব্য প্রভাবের ফলেই তাঁর মহতী শক্তি ও স্নেহসুধার বাহ্য প্রকাশরূপে ভক্তের কণ্ঠে স্তবগাথা প্রকাশিত হয়। তিনি ব্যতীত তাঁর লীলাময় ভূমিকা অকথিত থাকে। তিনি যেন নিজেই তৃপ্তা ও প্রসন্না হয়ে ভক্তকে মুগ্ধ করেন। মুগ্ধভক্ত মায়ের নিকট প্রার্থনা করেন, তিনি যেন তাঁর মোহিনী শক্তিবলে অত্যাচারী মধুকৈটভকে প্রভাবিত করে হতোদ্যম করেন।

মধুকৈটভ অসুর ভাবের মুখ্য প্রতীক। মধু অর্থে আনন্দ - মদ বা মত্ততা। দম্ভ, দর্প, অহংকারাদি জনিত মত্ততা। কৈটভ অর্থে দীপ্তি পাওয়া অর্থাৎ মদ ভাব যার দ্বারা প্রকাশ পায়। ইহারা ভ্রাতৃ সম্বন্ধ বিশিষ্ট ও তম ভাবের প্রতীক। মহামায়ার প্রভাবে বিষ্ণু যোগনিদ্রামগ্ন হওয়ায় মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত। ব্রহ্মা আসুরিক অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিষ্ণুর জাগরণ ও অসুর-নিধন প্রার্থনা করেছেন।

ঋষিরুবাচ—

শ্লোক :— *এবং স্তুত্বা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা।*
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ।।৬৬
নেত্রাস্য-নাসিকাবাহু-হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ।
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽ ব্যক্তজন্মনঃ।।৬৭

শব্দার্থ :— বেধসা - ব্রহ্মা কর্তৃক, প্রবোধনার্থায় - জাগরণের জন্য; উরস - বক্ষস্থল, অব্যক্ত জন্মনঃ - স্বয়ম্ভূ।

বাংলা শ্লোকার্থ :— ঋষি বললেন, ব্রহ্মার এইরূপ স্তবে তামসী দেবী বিষ্ণুর জাগরণ ও মধুকৈটভ বধের জন্য বিষ্ণুর চক্ষু নাসিকা মুখ হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হতে নির্গত হয়ে ব্রহ্মাকে দর্শন দিলেন।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— ব্রহ্মার ব্যাকুল স্তব ও প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তখন মহামায়া জগতজননী তামসীদেবী মা কালীরূপে মধুকৈটভ নিধনের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর জাগরণের জন্য যোগনিদ্রা হতে আবির্ভূতা হলেন। তামসিক গুণ সম্পন্ন অসুরদের বধ করার জন্য দেবী মহামায়ার খড়্গ শূল প্রভৃতি অস্ত্রে বিভূষিতা হয়ে তামসী দেবীরূপা মাকালীর ভয়ঙ্করী মূর্তিই এখানে শোভনীয়। অপরূপা মা সাধনা ও প্রার্থনাগুণে গুণময়ী হয়ে ভক্তের অভিপ্রায় অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ করে বরাভয় দান করেন।

প্রাণশক্তির বিশেষ অনুভূতি কেন্দ্রগুলি যথা চোখ, মুখ, নাক, বাহু, হৃদয়, বক্ষঃস্থল হতে প্রকাশিতা হয়ে যোগনিদ্রারূপা তামসীদেবী ব্রহ্মার গোচরে আসেন। ফলস্বরূপ মাতৃভাবে বিভোর প্রাণ বা বিষ্ণুর মধ্যে অব্যক্ত শক্তি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং ঐ সকল অঙ্গে বিক্ষেপ বা স্পন্দন বোধ হয়। উচ্চ মার্গের যোগীসাধকদেরও এইসব লক্ষণ প্রকাশ পায়। মন্ত্রে ব্রহ্মাকে অব্যক্তজন্মারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অব্যক্ত বা প্রকৃতি বা মহত্তত্ত্ব থেকেই মনের জন্ম। মন মধ্যে মানসিক বৃত্তিসমূহাদিই একত্রিতভাবে মন বলা চলে। আমাদের নানা মানসিক বৃত্তিরূপা চিন্তার তরঙ্গগুলি অজানা কোন অব্যক্ত কেন্দ্র হতে উদয় হয়ে আবার যেন সেই অব্যক্ত ক্ষেত্রেই বিলীন হয়ে যায়। তাই মন স্বরূপ ব্রহ্মা অব্যক্তজন্মা। এই অব্যক্ত ক্ষেত্রই পরমার্থের কেন্দ্র। *...ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায় (অবসরপ্রাপ্ত)
বহরমপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

কৃষ্ণ কথা

ভক্তিমতী ভানুমতীর কথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

যদু বংশীয় 'ভানু' নামক এক যাদবের কন্যা ভানুমতী। ষট্‌পুর জয়ের পরে শ্রীকৃষ্ণ সহ অন্যান্য যাদবগণ পিণ্ডারক তীর্থে রাসলীলাতে মাতিয়া উঠেন। তখন 'বারুণী' উৎসব চলিতেছিল। এই সময় 'নিকুম্ভ' নামক একজন জনৈক দৈত্য ভানুমতীকে হরণ করে। কন্যার কান্নায় বসুদেব ও উগ্রসেন বাধা দিবার জন্যে গমন করেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পান না। ইঁহারা এই কথা তখন শ্রীকৃষ্ণকে জানান। শুনিবামাত্রই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ছুটিয়া যান এবং বজ্রপুরের নিকটে নিকুম্ভের সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ হয়। তথা হইতে নিকুম্ভ তখন ভানুমতীকে লইয়া গোকর্ণে এবং তৎপরে ষট্‌পুরে আসেন। তখন প্রদ্যুম্ন ও অর্জুনের সহিত আবার যুদ্ধ হয়। শেষে শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যকে বধ করেন। দেবর্ষি নারদ জানান যে রৈবতকে কোনও সময়ে দুর্বাসা মুনি ভানুমতীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শাপ দেন যে তিনি অপহৃতা হইয়া শত্রু-হস্তে পতিত হইবেন। পরে নারদের কথায় দুর্বাসা ভানুমতীকে নিরপরাধা জানিয়া, নারদেরই পরামর্শে তখন তাঁহাকে -'শোভন স্বামী প্রাপ্ত হইবে' বলিয়া বর প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও প্রদ্যুম্নের সাহায্য লইয়া ভানুমতীকে নিকুম্ভ দৈত্য-হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। তদনন্তর ভানুমতীর পিতা শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ভক্তিমতী ভানুমতীকে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেবের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। পঞ্চম তথা কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মধ্যে কোনও একজনের অংশসম্ভূত ছিলেন। সহদেবের দেব-দেহ হওয়ায় তিনি শৌর্য্যে-বীর্য্যে অতি সুশোভন ছিলেন।

(সহায়ক গ্রন্থ ঃ হরিবংশ)

গীতা ভাবনা
(৩০)

গীতার প্রারম্ভিক গল্পকে সানফ্রানসিস্কোয় ২৮ শে মে'র বক্তৃতায় স্বামীজি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন— 'আমাদের কাছে এই জগতের জীবন হল এক অবিরাম যুদ্ধক্ষেত্র।' ভীরুতার কোনও অবকাশ জীবনে নেই। দুর্বল অর্জুন ভীরুতাকে ক্ষমা হিসাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন গীতার প্রথম অধ্যায়ে। ভাবাবেগ শুদ্ধচৈতন্য নয়, তা পাশব প্রবৃত্তিমাত্র। এ সম্পর্কে স্বামীজির মন্তব্য হল —'অর্জুনের মনে আবেগ ও কর্তব্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। যত আমরা পশু ও পাখিদের কাছে যাই, তত আমরা আবেগের কবলে গিয়ে পড়ি। তাকে আমরা বলি ভালবাসা, ওটা আত্মছলনা। আমরা পশুদের মতো আবেগের অধীন হয়ে পড়ি। গরু বাচ্ছার জন্য জীবন ত্যাগ করতে পারে। প্রত্যেক পশু পারে। তাতে কী? এই অন্ধ, আচ্ছন্ন আবেগ পূর্ণতায় নিয়ে যায় না। মানুষের লক্ষ্য হল, শাশ্বত চেতনায় পৌঁছান! সেখানে আবেগ, ভাবপ্রবণতার, কোনও ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির স্থান নেই, আছে শুদ্ধ বুদ্ধির আলোক যেখানে মানুষ আত্মারূপে দেখা দেয়।

অর্জুন এই আবেগের অধীনে রয়েছেন। যা হওয়া উচিৎ, তিনি সেরকম অতি সংযত, বুদ্ধিদীপ্ত ঋষির মতো বুদ্ধির শাশ্বত আলোকে স্নাত নন। তিনি পশুর মতো, শিশুর মতো বুদ্ধিকে হৃদয়ের দ্বারা চালিত করে মূর্খের মতো কাজ করেছেন, ভালবাসা ইত্যাদি মিষ্টি কথা দিয়ে নিজের দুর্বলতাকে ঢাকার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণ সেটা বুঝতে পারলেন। অর্জুন অজ্ঞ লোকের মতো কথা বলেছেন, বহু যুক্তি দেখাচ্ছেন, কিন্তু সেই সব কথা অজ্ঞানচিত।' (স্বাক্ষরতা প্রকাশন বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড ২২০ পৃ)।

স্বামীজি বুদ্ধির সাহায্যে বেদান্তের আলোকে অর্জুনের মানসিকতা ও কৃষ্ণের উক্তির তাৎপর্য অনুধাবন করতে চেয়েছেন। দেবতার কাছে আত্মসমর্পণ করলে কাজ হয় না, আত্মশক্তিকে জাগ্রত করতে হয়। পরাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে গীতার অবস্থাকে দাঁড় করিয়ে স্বামীজি মন্তব্য করেছেন — 'ভীরু হয়ে তোমার কোনও লাভ হবে না। এক পা পিছিয়ে গেলে তুমি দুর্ভাগ্য এড়াতে পারবে না। তুমি সব দেবতার উদ্দেশ্যে কেঁদেছ। তাতে দুঃখ কি দূর হয়েছে? ভারতের মানুষ দু-কোটি দেবতাকে ডেকেও কুকুরের মতো মরে। এই দেবতারা কোথায়?' (স্বাক্ষরতা প্রকাশন বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড ২২১ পৃ)।

অর্জুনকে নিবিষ্ট হতে বলেছেন ভগবান। যজ্ঞবাদের মাধ্যমে যারা স্বর্গ চায় তারা বস্তুবাদী। তাদের আধ্যাত্মিক সাফল্য হয় না। গীতার তত্ত্ব উদ্ধৃত করে স্বামীজি দেখিয়েছেন— ত্রিগুণাতীত হওয়াই সফলতার মূল কথা। 'প্রকৃতির পারে, দ্বৈত অস্তিত্বের পারে, তোমার আপন চেতনার পারে যাও, ভাল-মন্দ নিয়ে চিন্তা কোরো না।' এই প্রসঙ্গে গীতার ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বিস্তৃতভাবে বলেছেন স্বামীজি। অপর একটি বক্তৃতায় জ্ঞান ও কর্মের মধ্যকার তত্ত্বালোচনা তিনি করেছেন। স্বধর্মে নিধনের সুন্দর শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যাও স্বামীজি দিয়েছেন। গীতা আলোচনার সময় তাঁর ভাষা যেমন সহজ সরল, তেমনি উদাহরণ দেবার সময়ে অন্য ধর্মের কথাও উপস্থাপিত করেছেন তিনি। অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে ভারতীয় ধর্মের আলোচনা স্বামীজির গীতালোচনার একটা বৈশিষ্ট্য।

গীতা বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী। এই বর্ণব্যবস্থার মূলে আছে গুণ ও কর্ম —'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' (গীতা ৪/১৩)। মোক্ষ যোগের ৪৩ শ্লোকে ক্ষাত্রধর্ম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ধৃতি বা ধৈর্য, কর্মকুশলতা এবং যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, তাই সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, সব কিছুর ভাবনা পরিহার করে যুদ্ধের জন্য অর্জুনকে প্রস্তুত হতেই হবে। অর্জুন সেনাপতি বলে তার পক্ষে বিচার সাজে না। নিষ্কামভাবে রাজার আদেশ পালন করাই তার কর্তব্য। এজন্য নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নিয়ে আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। শাস্ত্রজ্ঞান অর্জুনের মনে আবর্ত সৃষ্টি করেছিল। তাই ভগবান তাকে যোগী ও স্থিতপ্রজ্ঞ হতে বলেছেন।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে পরপর অধ্যায়গুলির অনেক শ্লোকের ব্যাখ্যাই স্বামীজি করেছেন এবং কর্মযোগকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। ঊনিশ শতকের বাংলাদেশে কর্মযোগের ব্যাখ্যা ব্যাপক প্রচলিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনেকে দেশাত্মবোধের জাগরণের কারণে কর্মযোগকে আশ্রয় করেছিলেন। স্বামীজির কর্মযোগের ব্যাখ্যা তেমনটি না হলেও

নিষ্কামভাবের উপরে জোর আছে। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করতে গিয়ে তিনি গীতার কথা যেমন বলেছেন তেমনি অন্যান্য শাস্ত্রের কথাও বলেছেন। স্বামীজির গীতা-ভাবনাকে বুঝতে হলে তাঁর দ্বারা উদ্ধৃত ও অনুদিত শ্লোকগুলির উপক্রম ও উপসংহারের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

গীতা সম্পর্কে স্বামীজির মনোভাবের প্রকাশ আলমোড়া থেকে শ্রীযুক্ত প্রমদানন্দ মিত্রকে লেখা একটি পত্রে পেয়েছি (পত্রাবলী ৩৪৯ পত্র)। প্রমদানন্দ বাবু বিবেকানন্দকে একটা গীতার ইংরেজি অনুবাদ পাঠিয়েছিলেন ইংলণ্ডে। সেই সম্পর্কে স্বামীজি বলেছেন - 'উপনিষদ ও গীতা যথার্থ শাস্ত্র'। রামানুজ শঙ্কর প্রভৃতির ভাষ্য সম্পর্কে তাঁর কথা হল — 'রামানুজ শঙ্করাদি সঙ্কীর্ণ হৃদয় পণ্ডিতজি মাত্র'। আলমোড়া থেকে ১ জুনে (১৮৯৭) লেখা পত্রে গীতার প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেছেন (৩৫০ নং পত্র) 'গীতা নিশ্চয়ই এতদিনে হিন্দুধর্মের বাইবেল স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং উহা সম্পূর্ণরূপেই ওই সম্মানের উপযুক্ত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মূল চরিত্র বর্তমানে এতটা কুয়াশায় ঢাকা আছে যে, তা থেকে জীবনগ্রন্থ উদ্দীপনা লাভ করা বর্তমান কালে অসম্ভব। বিশেষত বর্তমান যুগে নতুন নতুন চিন্তা প্রণালী ও নতুন ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।' স্বামীজির এই কথায় আচার্য শঙ্করের কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন - অন্যান্য শাস্ত্র পড়ার দরকার নেই। গীতাকে ভালভাবে গান করলেই সমস্ত শাস্ত্রার্থের জ্ঞান সম্ভব হবে। 'গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্ম বিনিঃসৃতা।।' আলমোড়া থেকে একই দিনে স্বামী শুদ্ধানন্দকে লেখা একটি পত্রে (৩৫১ পত্র) জানিয়েছেন — হিমালয়ের নয়নানন্দকর পরিবেশে আলমোড়া শহরে প্রত্যেক সন্ধ্যায় তাঁর গুরুভাই অচ্যুতানন্দ বহুলোককে একত্রিত করে গীতা পাঠ ও আলোচনা করেন। সেই আলোচনায় শহরের অধিবাসীরা তো আসেই এমনকী সৈন্যাবাস থেকে সৈন্যরাও গীতার আলোচনা শুনতে আসে।

স্বামীজি শাস্ত্রের আলোচনা করতেন রহস্যকে বোঝার জন্য, শুষ্ক পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য নয়। স্বামী শুদ্ধানন্দ গীতার 'যাবানর্থ উদপানে' (২/৪৬) শ্লোকের যে অর্থ করেছিলেন সেই অর্থ স্বামীজির মনঃপূত হয়নি। শ্লোকের অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। শঙ্করের ব্যাখ্যাকে প্রথমতঃ মেনে নেবার কথা তিনি বলেছেন। তারপরে নিজেও অন্য প্রকার আলোচনা করেছেন। সমগ্র পত্রটি শুদ্ধ ঝরঝরে সংস্কৃতে লেখা। স্বামীজির সংস্কৃত-জ্ঞান ও শাস্ত্র-জ্ঞানের যুগপৎ পরিচয় পত্রটিতে আছে।

গীতার অনেক অংশ স্বামীজির কণ্ঠস্থ ছিল বলে বক্তৃতা ও পত্রাবলীতে নানা সময় গীতার উদ্ধৃতি তিনি ব্যবহার করেছেন। গীতার ভাষায় কাঠিন্য কম বলে তাঁর শিষ্যরা সহজেই সেই ভাবে প্রবেশ করতে পারতেন। অতএব গীতা এবং তার প্রসার নিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠা ছিল না। উপনিষদের তত্ত্ব উদ্ধারে এবং পাণিনি ব্যাকরণের মাধ্যমে বেদের ভাষায় প্রবেশ করে তত্ত্ব উদ্ধারের জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশে বেদকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। এজন্য বেদবিদ্যালয় স্থাপনের স্বপ্নও তিনি দেখেছেন। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এই বিষয়টির উপরে আলোকপাত করার ইচ্ছা রইল।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

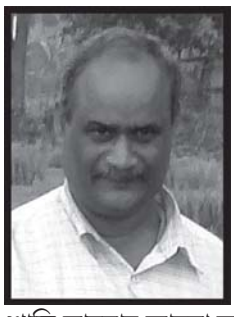

১৪২৩ সালের বিদায় মুহূর্তে ও ১৪২৪ সালের আগমনের প্রারম্ভেই চিরবিদায় জানাতে হল আমাদের সকলের শর্মাজীকে (গুরুভ্রাতা শ্রীবীরেন্দ্র শর্মা)। অখণ্ড মহাপীঠের গোড়াপত্তনের সময় থেকেই শর্মাজী উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে তাঁর প্রতিটি কর্মই অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণভাবে পালন করতেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠতা ছিল নজিরবিহীন। ছোট-বড় প্রত্যেক গুরুভাই-বোনেরই তিনি ছিলেন শর্মাজী। আশ্রমের প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল আন্তরিক। সদাহাস্যময় এই মানুষটি বহু ক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানান কাজ করতেন। তাঁর অমলিন হাসি ও আন্তরিক ব্যবহার আমরা কখনোই বিস্মৃত হব না। লোকান্তরে তাঁর শান্তি কামনায় আমরা সকল গুরুভাইবোন একাত্মচিত্তে প্রার্থনা জানাই গুরুমহারাজদের শ্রীচরণে।

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

অষ্টবিংশ পর্য্যায় — (বৃষাকপি)

ঋগ্বেদের অপ্রধান দেবতা বৃষাকপির স্বরূপ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা রকম মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। দশম মণ্ডলের একটি মাত্র সূক্তে (১০/৮৬) ইন্দ্র ও তাঁর পত্নী ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বৃষাকপির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে বৃষাকপি ইন্দ্রের প্রিয়পাত্র হলেও ইন্দ্রাণী কিন্তু তার উপরে অত্যন্ত রুষ্টা। ইন্দ্র ইন্দ্রাণীকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন — ''ইন্দ্রাণী! তোমার বাহু, কেশ, কপাল, আঙ্গুল সব অত্যন্ত সুন্দর। তুমি বীরের পত্নী হয়ে বৃষাকপিকে বিদ্বেষ করছ কেন?'' (ঋগ্বেদ ১০/৮৬/৮)। ইন্দ্র জানিয়েছেন বন্ধু বৃষাকপিকে ছাড়া তিনি তৃপ্ত হন না এবং সে সরস হোমদ্রব্য দেবতাদের কাছে নিয়ে যায় (১০/৮৬/১২)। এই সূক্তটি ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী ও বৃষাকপির মধ্যে কথোপকথনাত্মক। এর দেবতা ও ঋষি একই। সূক্তটির যাজ্ঞীক বিনিয়োগও আশ্বনায়ন শ্রৌতসূত্রে দেখান হয়েছে (আ.শ্রৌ-৮/৩)। কিন্তু এখান থেকে কোন বিশেষ তাৎপর্য আবিষ্কার করা সম্ভব নয় বরং আপাত অর্থ ধরলে সূক্তটিতে বিকৃত কামের কিছু তথ্য পাওয়া সম্ভব। বৃষাকপির উপরে ইন্দ্রাণী ক্রুদ্ধ হলেও তার পত্নীকে ইন্দ্রাণী নিজের পুত্রবধূ বলেছেন। সূক্তটির ধ্রুবপদে ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে বলা হয়েছে 'বিশ্বস্মাত্ ইন্দ্র উত্তরঃ', এই ধ্রুবপদের মাধ্যমে। ইন্দ্রাণী বৃষাকপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, 'অবীরামিব মামযং সরারুরভিমন্যতে। উতাহসাস্ম বীরিণীন্দ্রপত্নী মরুৎসখা বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ।।'(১০/৮৬/৯)

অর্থাৎ, 'হিংস্রক বৃষাকপি আমাকে যেন পতিপুত্রবিহীনার মত জ্ঞান করছে। কিন্তু আমি পতিপুত্রবতী ইন্দ্রের পত্নী, মরুৎগণ আমার সহায়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।' বৃষাকপি ইন্দ্রাণীকে মাতা বলে সম্বোধন করে আশ্বাস দিয়ে বলেছে — 'হে মা! তুমি উত্তম পতি পেয়েছ। তোমার অঙ্গ, উরু ও মস্তক যেমন দরকার তেমনি হবে। পতি সংসর্গে তুমি আনন্দ পেতে থাক (১০/৮৬/৭)। একটি মন্ত্রে বৃষাকপিকে আবার আসার জন্য আহ্বান জানান হয়েছে — 'হে বৃষাকপি! তুমি আবার এস। তোমার জন্য উত্তম যজ্ঞভাগ প্রস্তুত করছি, নিদ্রাবিলাসী সূর্যদেব যেমন অস্তধামে গমন করেন, তুমিও তেমনি গৃহের মধ্যে এস'(১০/৮৬/২১)। বৃষাকপি হৃষ্টপুষ্ট এবং ইন্দ্রের সঙ্গে সোমপানে মত্ত হন। সে হরিদ্বর্ণ, মৃগমূর্তিধারী। ইন্দ্র তাকে রক্ষা করেন। পরধন গ্রহণকারী ব্যক্তিদের বধ করেন বৃষাকপি। কিন্তু ১০ম মণ্ডলের আখ্যানের ধারা বেয়ে লৌকিক জগতের অনেক সত্যের সন্ধান পাওয়া গেলেও এই দেবতার স্বরূপ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করাই সম্ভব হয় না।

বৃষ আর কপি এই দুটি সংস্কৃত শব্দ থেকে বৃষাকপিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। বৃষ হল ষাঁড় এবং কপি হল বানর। তাই একপ্রকার বানর হল বৃষাকপি। ঋগ্বেদের অনুবাদক ও সম্পাদক শব্দার্থ ধরে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটা আখ্যানের সাহায্য নিয়েও সামগ্রীক ভাবে সিদ্ধান্ত করতে পারলেন না। তিনি সূক্তটিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে রায় দিলেন। তাঁর লেখা ১০/৮৬/২৩ ঋক্‌মন্ত্রের পাঠ টীকায় পাই —'বৃষাকপির প্রকরণ একটি দুরূহ অংশ। বোধহয় একটি গল্প ছিল যে বৃষাকপি নামক ইন্দ্রের প্রিয়পাত্র ইন্দ্রের প্রাপ্য যজ্ঞসামগ্রী নষ্ট করেছিল এবং যজমান ও ইন্দ্রাণী তাতে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এ সূক্তটি বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক।' অনেকে এসব মতের সমর্থক হলেও বানর কিভাবে ইন্দ্রের প্রিয় হবে অথবা তার সঙ্গে সোমপান করবে? অতএব সঠিক কোন সিদ্ধান্ত করতে না পেরে পণ্ডিতেরা আবার অন্যভাবে বৃষাকপির উৎস সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। প্রকৃতিতত্ত্ব ও মহাকাশের ঘটনার মধ্যে বৈদিক দেবতত্ত্বের অন্বেষণকারী একদল পণ্ডিত আছেন, তাঁরা তাঁদের মত করে বলেছেন। বালগঙ্গাধর তিলক বলেছেন যখন দিন ও রাত্রি সমান হয় সেই হল বিষুব কালীন সূর্যের প্রতিনিধি বলেছেন।

(বৃষাকপি সূক্তটিকে অনেক পণ্ডিত আধুনিক বলে মনে করেন না। বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তিলকের মতই নক্ষত্রের মধ্যে বৃষাকপির ব্যাখ্যা পেয়েছেন। তাঁর মতে বৃষাকপির উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান হত সুদূর অতীতে অন্ততঃ ৩০ হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তখন বৃষাকপি মৃগশিরা নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্য দিয়ে গমন করেছিল। পরে বৃষাকপিকে বিষুবরেখার উপরে দেখা গিয়েছিল খ্রী.পূঃ ২৩ শো অব্দে। আবার খ্রী.পূঃ. হাজার অব্দে বৃষাকপিকে দক্ষিণে দেখা গিয়েছিল। তিলকের মতে বৃষাকপি সূক্ত ১৬ হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের আগেকার।)

হিলেব্রান্ট এনাকে নক্ষত্রপুঞ্জ বলে রায় দিয়েছেন। কিন্তু সূক্তের মধ্যে এসব মতের সমর্থনসূচক কোন কথা পাওয়া যাচ্ছে কি? পাশ্চাত্য পণ্ডিত Bergaigne বৃষাকপিকে একপ্রকার প্রতীকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে যান। বৃষাকপি তাঁর মতে সোমের প্রতিনিধি এবং ইন্দ্র পত্নী ইন্দ্রাণী প্রার্থনার

প্রতীক। 'Minor Vedic deities' গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে "This bizarre myth would symbolize the frequently expessed idea that Indra loves neither the sacred beverage without prayer nor prayer without the sacred beverage. He wishes, therefore, his union with prayer to be accompanied by the union of prayer with 'soma' and he neglects sacrifice as long as this union of prayer with two essential elements of worship remain unaccomplished!"

কোনভাবেই বৃষাকপির প্রকৃত অর্থ পাওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ না আমরা যাস্কের নিরুক্তের সাক্ষ্য গ্রহণ করব। নৈরুক্তধারা বেদের দেবতাদের মধ্যে প্রকৃতির রূপক লক্ষ্য করেছে বলে প্রাকৃতিক ব্যখ্যার মাধ্যমে দেবতার স্বরূপকে বুঝতে চেয়েছেন— 'অথ যদ্রশ্মিভিরভি প্রকম্পয়ন্নেতি তদ্‌বৃষাকপির্ভবতি বৃষাসম্পনঃ' (নিরুক্ত ১২/২৭/৬)। অর্থাৎ অস্তাচলগামী সূর্য হলেন বৃষাকপি। বৃষা শব্দের অর্থ বর্ষণকারী এবং কপি শব্দের অর্থ কম্পনকারক। সূর্যাস্ত হতে দেখে দিবাচারী প্রাণীরা ভয়ে কাঁপতে থাকে। অস্তাচলগামী সূর্য হিমরাশি বর্ষণ করেন এবং রাত্রিতে ভীত প্রাণীদের মধ্যে কম্পন জাগান। আদিত্যকেই বৃষাকপি শব্দের অর্থ বলে দেখান হয়েছে অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণে — 'আদিত্যো বৈ বৃষাকপিঃ তদ্ যৎ কম্পয়মানো রেতো বর্ষতি তস্মাদ্ বৃষাকপি তদ্ বৃষাকপের্বৃষাকপিত্বম্' (গোপথ ব্রাহ্মণ ২/৬/ ১২)। শব্দনিরুক্তিকে সমর্থন করতে গিয়ে যাস্ক তাঁর নিরুক্তে ঋগ্বেদের ১০/৮৬/২১ মন্ত্রটি উদ্ধৃত করেছেন —

পুনরেহি বৃষাকপে সুবিতা কল্পয়াবহৈ।
য এষ স্বপ্ননংশনোহস্তমেষি পথা পুনর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ।।

মন্ত্রের তাৎপর্য হল — হে বৃষাকপে! তুমি আবার এস অর্থাৎ উদিত হোয়ো। সুবিহিত যাগাদি কর্ম আমরা দুজনে মিলে সম্পন্ন করব। তুমি 'স্বপ্ননংসনঃ' অর্থাৎ স্বপ্ননাশক বা নিদ্রাব্যাঘাতকারী। সূর্য উদয়ে প্রাণীদের নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এবং স্বপ্ন দেখাও শেষ হয়। আদিত্য উদয়ের দ্বারা স্বপ্ন ও নিদ্রা ভঙ্গ করে দেন। তুমি সেই পথেই আবার অস্তগমন করছ। এভাবেই আদিত্য বা ইন্দ্র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে সূর্য বৃষাকপি হয়ে অস্তগমন করছে সে যখন আবার উদয়ের দ্বারা যজ্ঞারম্ভ করবেন আর পুরোহিতেরা যথাযোগ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা যজ্ঞারম্ভ করবেন।

বৃষাকপি আদিত্য বা সূর্যের রূপভেদ একথা শৌনকের বৃহদ্দেবতা গ্রন্থেও বলা হয়েছে। কপিলবর্ণ বৃষভের রূপ ধারণ করে আকাশে আরোহণ করেন বলে তিনি বৃষাকপি, তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ। নিরুক্তকার যেভাবে কম্পনাদির কথা বলেছেন বৃহদ্দেবতাকারও সেইভাবেই ব্যাপারটিকে দেখেছেন —

বৃষাকপিরসৌ তেন বিশ্বমাদিন্দ্র উত্তরঃ।
রশ্মিভিঃ কম্পয়ন্নেতি বৃষা বর্ষিষ্ঠ এব সঃ।।
সায়াহ্নকালে ভূতানি স্বাপয়ন্নস্তমেতি যৎ।
বৃষাকপিরিতো বা স্যাদিতি মন্ত্রেষু দৃশ্যতে।।
(বৃহদ্দেবতা ২/৬৯/৪০)

প্রাচীন ভারতে সূর্য বিষ্ণুনামে অভিহিত হতেন। বিষ্ণু বা আদিত্যের ত্রিপাদ বিক্ষেপের ঘটনা প্রকৃতপক্ষে সবনত্রয়ের বা উত্তর ও দক্ষিণায়ণ ও বিষুববিন্দুতে অবস্থানের কথা ছিল। নিরুক্ত এভাবেই ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। পুরাণকারেরা এই তাৎপর্যকে ব্যাখ্যার জন্য বিষ্ণুর বামন অবতারে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনার উপন্যাস উপস্থাপিত করেছেন। পরবর্তী সাহিত্যে বিষ্ণুর সহস্র নামের তালিকায় তাই আমরা বৃষাকপি নামটি পাই।

বৃষাকপি যদি সূর্য হন তাহলে তাঁর পত্নী বৃষাকপায়ীকে সূর্যা হতে হয়। সূর্যেরই অপর প্রেমিকা ঊষা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে পৃথিবীতে। সুন্দরী ঊষার পিছনে পিছনে প্রেমিকার মত সূর্য ছুটে চলেন এরূপ চিত্রকল্প ঋগ্বেদে অনেকবার পাওয়া গিয়েছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বৃহদ্দেবতায় বলা হল —'বৃষকপায়ী সূর্যোষাঃ সূর্যস্যৈব তুপত্নয়'(২/৮)। সূর্যের তিনটি রূপের সঙ্গে তার তিনটি পত্নীর রূপের কথা বৃহদ্দেবতায় কথিত হয়েছে - সূর্যোদয়ের আগে যিনি ঊষা, মধ্যাহ্নকালে তিনিই সূর্যা আবার অস্তাচল গমনকালে তিনিই বৃষাকপায়ী। বৃহদ্দেবতার ৭/১১৯-১২১ শ্লোকে তাই বলা হল—'সাবিত্রী চৈব সূর্যা চ সৈব পত্নী বিবস্বতঃ।
স্তুতা বৃষাকপায়ীতি।।' (বৃহদ্দেবতা ২/৬৯/৪০)

বৃষাকপি যদি সূর্য হন তাহলে বৃষাকপায়ীকে সূর্যপত্নী হতেই হবে। শৌনক বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে সূর্যকেই বৃষাকপি বলেছেন। যাস্কের ব্যাখ্যার সঙ্গে শৌনকের ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য দেখা যায়। বেদের অনেক ক্ষেত্রেই সন্দিগ্ধস্থলগুলিতে যাস্ক যেভাবে দেবতার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করে একটা স্পষ্ট পথনির্দেশ করেছেন অন্যত্র তা তত স্পষ্ট হয়নি। সেদিক থেকে দেবতত্ত্বের আলোচনায় নিরুক্তের তাৎপর্য্য অসীম।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনাভাস

মহাবতার বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীমাণিকলাল দত্তের জীবনী

(২)

দৈববাণী ও জন্মরহস্য—

শ্রীভগবান বলিলেন, ''জন্ম কর্ম্ম চমে দিব্যম্...।''৪/৯

ঈশ্বরকোটী মহাপুরুষগণের জন্ম ও কর্ম দৈবসম্ভূত।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মাণিকলালের পিতা শ্যামাচরণ কাশীধামের মহাপুরুষ শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামীর কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাণিকলালের জন্মের বহু পূর্বে সেই যোগীপ্রবর

মাণিকলালের পিতার নিকট দৈববাণী করিয়াছিলেন যে তাঁহার গৃহে 'ধনুরাশির' লীলা হইবে। এই অমর বাণী মাণিকলালের পুণ্য আর্বিভাবে কিভাবে যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল - তাহার প্রতি পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া, উত্তরকালে মাণিকলাল ঐ সূত্রে তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে (যাহা — আমাদের মধ্যে 'Red Book' নামে প্রচলিত) লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারই কিছু অংশ প্রাসঙ্গিক বোধে উদ্ধৃত করিতেছি।

"It is a most Condescending favour in which this great Saint (Trailangaswami) added, that this Child when grown in grace, would in the voice of one Speaking behind, communicate to the regenerate ones, the first hand experience of god's redeeming grace. His mission would operate with an abiding efficacy, upon his conscience throughout his whole life and would be extensive as would bind in homage, the two divided hemi-spheres, into one harmonious concord of righteousness and order."

শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গ মহারাজের উক্তিতে শ্যামাচরণ অন্তরের আনন্দাতিশয্যবশতঃ ধীর চিত্তে পরম আগ্রহভরে গুরুর অমর বাণীকে হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়া বহির্জগতে প্রকাশের অভিজ্ঞান স্বরূপ একটি ক্ষুদ্র ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের প্রস্তর খণ্ডের উপর তীর-ধনুক চিহ্ন খোদাই করিয়া তাহা নিত্য ব্যবহার্য্য ঘড়ির চেনের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিলেন। উত্তরকালে মাণিকলাল আমৃত্যু তাহা ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দৈববাণীর কিছুকাল বিগত হইলে মাণিকলালের পুণ্য আবির্ভাব ঘটে ও পরবর্তীকালে জন্মচক্র বিচারে তাঁহার রাশি 'ধনু' হওয়ায় শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামীর ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইয়া প্রকটিত হইল। এ প্রসঙ্গে মাণিকলাল তাঁহার লেখনী মাধ্যমে যে চিত্র পরিস্ফুট করিয়াছিলেন তাহা এই —

"The living hope of my birth, as the first child with 'Dhanu Rasi' soon proved to be a - certainly, when I was born in the year 1890 and my Rasi chart was prepared by an ex-pert Astrologer, showing all the prospects assigned to me."

হিন্দুর শাস্ত্র দ্ব্যর্থক — অন্তরে ও বাহিরে। বহির্জগতে জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্‌গণ 'ধনু' রাশির গুণাগুণ বহুপ্রকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অন্তর্জগতে ইহার অর্থ ভগবানে অনুগত যে 'মন', তাহা ঊর্দ্ধগত হওয়ায় 'মনু' বলিয়া পরিগণিত হইলে সেই মনে শ্রীভগবানের অমৃতবাণী ধ্বনিত হয় এবং তাহা 'ধনু' নাম ধারণ করে। দ্বাপরে এই ধনু ধারণ করিয়াছিলেন মহাবীর গাণ্ডীবী পার্থ। তাই শ্রীভগবান বলিলেন —

''যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণো, তত্র পার্থো ধনুর্দ্ধর।'' (৭৮/১৮)

মাণিকলালের আজীবন সাধনভজন সমৃদ্ধ কর্মগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই শ্লোকের সার্থকথা পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

মাণিকলালের জন্ম ও কর্ম সংশ্লিষ্ট তাঁহার আরও কিছু বক্তব্য তাঁহারই রচনা হইতে এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি —

"While I took round upon the prodigious resources of a fruitful soil, I find the follow-ing points, which are regarded as incontro-vertible "Bible evidence" published in one of

the Biglow papers, in 848, as the wisdom of the poet Lowell's advice and again in the 'Beyond the mysticdoor'." (by Mr.Allon Poole)

1. "The year 1914" will be the farthest limit of the rule of imperfect man."
2. In that year, "the kingdom of God will be set up." on the Earth, on the ruins of present institutions.
3. Christ will be present before that date, "as Earth's new Ruler."
4. Before the end of A.D 1914, the last member of the church of Christ, the body of Christ, will be glorified with the Head."
5. From that time Jerusalem will no longer be trodden under foot, because the 'time of the gentiles' will be fulfilled.
6. "Israil's blindness will begin to pass away."
7. The Great Tribulation will reach it's climax in worldwide anarchy.
8. Before 1914 "God's Kingdom, Organised in power, will be in the Earth."

বহু সহস্র বৎসর বয়োধারী মৃত্যুঞ্জয়ী কৈলাসবিহারী শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ যিনি সর্বকালের, সর্বযুগের লীলার পশ্চাতে আছেন ও যাঁহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়ই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হইয়াছে, অতীব কৃপা পরবশ হইয়া ১৯১১ সালে মাণিকলালের মস্তক স্পর্শ করিয়া দীক্ষাদান করেন এবং উক্ত সাল হইতেই গুরুপ্রসাদে সর্বধর্মীয় শাস্ত্র সমন্বয়, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশের বাইবেল শাস্ত্রের সহিত প্রাচ্যের হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থগুলির মৌলিক সূত্রগুলির সামঞ্জস্য বিধানে ও বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেন মাণিকলাল। মুখ্যতঃ তাঁহার এই কর্মযজ্ঞকে কেন্দ্র করিয়া তৎকালীন বহু বিদগ্ধ ও উচ্চ পর্য্যায়ের ইউরোপীয় সাধক ও জ্ঞান তপস্বী যাঁহারা অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞানযজ্ঞে আহুতি প্রদান করিলেন, তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পর্য্যায়ক্রমে সাধ্যমত লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। যে সাধনাকে মাণিকলাল তাঁহার গুরুর অসীম কৃপায় জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অনুধাবন করিলে ইহা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে মাণিকলালই ছিলেন "Last member of the church of Christ", বাইবেল শাস্ত্র এশিয়ার সপ্ত চার্চের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং এই সপ্ত চার্চের সপ্ত সেন্ট ছিল। হিন্দুধর্মেও অনুরূপ সপ্তর্ষি মণ্ডলের উল্লেখ আছে। এই সপ্তর্ষি মণ্ডলের বা সপ্ত চার্চের শেষ ঋষি বা সেন্ট যিনি, তিনিই, মাণিকলাল দত্ত নামে জাগতিক রাজ্যে আমাদের নিকট পরিচিত ছিলেন। উপলব্ধি সাপেক্ষে ইহাই আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইয়াছে, মৃত্যুঞ্জয়ী বাবাজী মহারাজ তাঁহার দৈব বাসনার বশবর্তী হইয়া বিশ্ববাসীর হিতচিকীর্ষায় যুগে যুগে শ্রীভগবানের সাযুজ্যে দেহ ধারণ করতঃ এই লীলা সম্পাদন করিয়াছেন।

বিগত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বিশ্বধর্ম মহাসভায় মাননীয় সভাপতি স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজবেণ্ড ইংলণ্ডের এই সভার বাৎসরিক অধিবেশনে অতীব কাতর ও ব্যথাতুর হৃদয়ে আবেদন করিলেন, ‘‘ধর্ম এক্ষণে সর্বত্রই ধ্বংস গত ও অবলুপ্তপ্রায় হওয়ায় ধর্মের অস্তিত্ব সন্ধানের জন্য আমরা যেন ভারতের উপরই নির্ভর করিয়া থাকি। ভারতই ধর্মের আদি পীঠস্থান। এই সময় ঘোরতম অন্ধকারে যেন ভারতই জগতকে দীপ্ত জ্ঞানালোকের ছটায় ধর্মপথ প্রদর্শন করে।’’ মাণিকলালের অমর বাণীর মধ্যে এই তপস্বী মহাপুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন, ‘‘যাঁহার চরণ কৃপালাভে, যাঁহার প্রভাব দর্শনে এই মহামানবের (স্যার ফ্রান্সিসের) জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, যে জ্ঞানোদয়ে সর্বত্যাগী হইয়া ধর্মসাধনে জগৎ কল্যাণকর বাণী তিনি সততঃই বিতরণ করিয়াছিলেন, সেই দীপ্তকান্ত, জীবনমুক্ত মহাপুরুষ আমার পরমারাধ্য গুরুদেব, আমার জীবন সর্বস্ব শ্রীশ্রীকৈলাস বিহারীর শ্রীচরণে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার কারণ কিছু সংক্ষিপ্ত বিবৃতি কীর্ত্তন করিতেছি। আশাকরি, আমার এই কীর্তনে আমার অগ্রজ গুরুভ্রাতা ঠাকুর শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় তৃপ্ত হইবেন এবং অশরীরী ভাবে যোগদান করিবেন।’’

...ক্রমশঃ

—শ্রীমাণিকলাল দত্তের শিষ্য,

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়

রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত

(৬)

ভগবান শঙ্করজীর দর্শন এবং জ্যোতিদর্শন — নৌখা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর বাপজী প্রত্যহ প্রত্যুষে সকাল ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে উঠিয়া বান-গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেন। সঙ্গে কাকিসা এবং গৌরী বাইসাও থাকিতেন। বিলাড়ার লুনী নদীকে বানগঙ্গা বলা হয়। বর্তমানে যেখানে শিবমন্দির হইয়াছে তাহার ৫০ মিটার দূরে প্রবাহিত এই নদীকেও বানগঙ্গা বলা হয় কারণ ঐ লুনী নদীর জল আসিয়া এখানে মিশিত। সেই জন্য বাপজী পরে এইখানেই স্নান করিতেন। বর্তমানে যেখানে শিবমন্দির হইয়াছে ঐ স্থানটি ছিল একটি শ্মশান। বাপজী স্নান করিবার সময় দেখিতেন যে, ঐ শ্মশান হইতে প্রায় এক ফুট উঁচু একটি জ্যোতিশিখা আসিয়া জলে পড়িত। তারপর সেই শিখা ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া বাপজী যেখানে স্নান করিতেন, তথায় আসিত। সেই উজ্জ্বল জ্যোতি কাকিসারাও দেখিতেন। একদিন কাকিসা ঐ জ্যোতি-শিখাকে পকেটে পুরিয়া গৃহে লইয়া চলিলেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া দেখিলেন যে, জ্যোতির চিহ্নও নাই, সেই স্থানে কালো একটি পোড়া চিহ্নের মত দাগ রহিয়াছে। এই রকম তিনি প্রায়ই দেখিতেন। একদিন বাপজী দেখিলেন, তাঁহার স্নানের স্থলে এক বিরাট আকার মহিষ জাতীয় একটি পশু। বাপজী তখন হাতজোড় করিয়া বলিলেন, ''ভগবান আপনাকে আমি এইরূপে দেখিতে চাহিনা, আপনাকে আমি যে রূপে দেখিতে চাই, সেইরূপে আমাকে দর্শনদান করুন।'' তখন পশুটি অদৃশ্য হইয়া গেল। বাপজী পরে বলিয়াছিলেন, ''ভগবান শঙ্করজী এইরূপে আসিয়াছিলেন।''

শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা — এই ঘটনা দুইটির কথা শ্রবণ করিয়া বাপজীর প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাপরায়ণা উমরাও বাইজী এবং তাহার ছোট ভগিনী স্থির করিলেন যে, এই পবিত্রস্থানে একটি শিব মন্দির করিতেই হইবে। এই সংকল্পে অটুট রহিয়া তাহারা মন্দির নির্মাণ উপলক্ষ্যে সবার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৯৪৮ খৃঃ মন্দির তৈরী হইলে বসন্ত-পঞ্চমীর দিন বাপজীর দ্বারা তথায় শিবজীকে প্রতিষ্ঠা করা হইল। সেই সময় বাপজী যে অখণ্ড-জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন আজও তাহা অব্যাহত গতিতে জ্বলিতেছে।

দামানাড়াতে তপস্যা — বালাগ্রাম হইতে চার কি.মি. দূরে দামানাড়া নামে একটি বড় পুষ্করিণী ছিল। এই পুকুরের পাড়ে প্রায় ৫০০ বৎসরের পুরাতন এক বিরাট তেঁতুল গাছ ছিল। এই পুরাতন বৃক্ষের বিস্তৃত ডালপালায় এবং তাহার সহিত লতাগুল্মাদি যুক্ত হইয়া স্থানটি এমনভাবে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল যে, সেই স্থানে প্রবেশ করিলে বাহির হইতে তাহা দৃষ্টিগোচর হইত না। এই স্থানটি যেমন শীতল ছিল, তেমনি ছিল সাপেদের রমণীয় বাসস্থান। ওখানে প্রবেশ করিতে কেহই সাহস পাইত না। সেই জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে এই স্থানটি বাপজীর খুবই মনঃপুত হইল। এই পুকুর পাড়ের বিস্তৃত ভূমি সবই মানসিংহের অধিকারভুক্ত ছিল। এই বনচ্ছাদিত শীতল স্থানটিতে ময়ূর, খরগোশ, হরিণেরা বিচরণ করিত এবং পক্ষীদের খুবই প্রিয় স্থান ছিল। এই স্থানে ভক্ত ভুরোজী রোজ গ্রাম হইতে দানা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পক্ষীদের তাহা বিতরণ করিতেন। পশু-পক্ষীরা দামানাড়ার জল পান করিত।

সতী হইবার পর হইতে বাপজী নিজ গৃহের ঘেরা বারান্দায় থাকিয়াই সাধনা করিতেন। তথা হইতে নৌখা চাঁদাবত গমনের পর হইতে গুরু গোলাপদাসের মত নির্জনে ঝোপড়িতে থাকিয়া সাধনা করিবার তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হইল। তখন তিনি এই নির্জন শীতল স্থানটিকে তাঁহার সাধনার স্থল বানাইলেন। এই নির্জন ভূমিতে তিনি সমস্তদিন কাটাইতে লাগিলেন এবং রাত্রিতে ফিরিয়া আসিতেন। বাপজীর সাধনার সময় বিরাট একটি নাগ তাঁহার সম্মুখে বসিয়া থাকিত, তাই কাহারো তাঁহার নিকট যাইবার সাহস হইত না। তিনি নিরন্তর ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার সমাধি হইতে লাগিল, তখন তিন-চার দিন হয়তো গৃহেই যাইতে পারিতেন না। তিনি তখন দামানাড়ার পুকুরেও স্নান করিতে আসিতে পারিতেন না। তাই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া লোকেরা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিত।

বাপজী একবার তাঁহার স্মৃতি রোমন্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, ''শীতের দিনে আমি জলে পরিপূর্ণ একটি ঘড়া আমার মস্তকের উপরে বৃক্ষের ডালে রাখিতাম। তাহা হইতে সর্বক্ষণ জল পড়িত। যতক্ষণ ঘড়া খালি না হইত, ততক্ষণ আমি আসন ত্যাগ করিতাম না।'' যোগমার্গে এই সাধনাকে বলে 'জলশায়ন'। এইভাবে দামানাড়ার তীরের জঙ্গলে তিনি তাঁহার পাকা সাধনাস্থল বানাইয়া লইলেন। বাহির হইতে অদৃশ্য এই স্থানে যদি কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত, তখন উচ্চঃস্বরে ডাকিলে তিনি বাহিরে আসিয়া দর্শন দিতেন। কথিত আছে, সন্ত শিরোমণি মীরাবাঈ যখন চিতোর হইতে

মেঢ়তা যাতায়াত করিতেন, তখন তিনি এই স্থানে বিশ্রাম করিতেন। বাপজীর কঠোর সাধনায় এই স্থানটি এখন একটি আধ্যাত্মিক তরঙ্গের পুণ্যভূমি হইয়াছে।

এই সময় শ্রীহরিনাথজী নামে এক সর্বত্যাগী তরুণ সন্ন্যাসী বাপজীর কথা লোকমুখে অবগত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি রাজপুতবংশীয় ছিলেন, তাই ভিক্ষা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। এইজন্য তিন দিন বিনা আহারেই তিনি ছিলেন দেখিয়া গ্রামবাসীরা রোজ আসিয়া তাঁহাকে খাদ্য দিয়া যাইতেন। তিনি বাপজীর দর্শন আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারই নিকটবর্তী একটি জাল বৃক্ষতলে বসিয়া সাধনা করিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি সাত বৎসর বাপজীর নিকটবর্তী স্থলে থাকিয়া সাধনা করিয়াছিলেন। বাপজীর সাধনা যখন ১২ বৎসর পূর্ণ হইল এবং সর্বক্ষণই সমাধিতে থাকিতেন, তখন তাঁহার গুরু গোলাপদাসজী মহারাজ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ''এখন আর তোমার সাধনার প্রয়োজন নাই। তুমি যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, এখন সেই কাজ কর। শিবমন্দিরে গিয়া এখন অবস্থান কর।'' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাপজী গুরুর আজ্ঞা মানিয়া লইলেন এবং শিবমন্দিরে চলিয়া আসিলেন। *...ক্রমশঃ*

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

আশ্রম সংবাদ

১৫ই এপ্রিল— বাং ১৪২৪-এর নববর্ষের সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের অভিলাষে বহু ভক্ত সমাগত হয়েছিলেন। সন্ধ্যায় সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমা উপস্থিত ভক্ত মণ্ডলী ক্রিয়াযোগ সম্বন্ধীয় অত্যন্ত গুঢ় সাধনার অমূল্য রহস্য কথা প্রবচন করেন।

১৬ই এপ্রিল — এইদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে আশ্রমে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত শিল্পী শ্রীঅরিন্দম গাঙ্গুলী।

২৮শে এপ্রিল — অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নে শ্রীঅন্নপূর্ণা ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীগজাননের পূজার মাধ্যমে তাঁর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।

১০ই মে — বুদ্ধ পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমা ক্রিয়াযোগ সাধন সম্বন্ধীয় শিক্ষণীয় কিছু উপদেশ দেন। প্রতিবারের মত আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরী পরিচালনা করেন গুরুভ্রাতা ডাঃ বরুণ দত্ত।

১লা জুন - ২০শে জুন — পুষ্করনিবাসী সন্ত শ্রীশ্রীটাটবাবা আশ্রমে এই কয়দিন অতিবাহিত করেন। এইসময় আশ্রমবাসীগণ তাঁর পূত সান্নিধ্যলাভে ধন্য হন।

৯ই জুন — শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব তিথি পালিত হয়। সকালে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা অন্নক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রী গুরুপূজা। দ্বিপ্রহরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আশ্রম মন্দিরে একটি ভজনের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ। অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্বে শ্রীশ্রীমার স্বকণ্ঠে অতি সুমধুর কিছু ভজন ও স্তব সকলকে বিমোহিত করে।

২৫শে জুন — এইদিন সন্ধ্যায় আধ্যাত্মিক সভার ২৩ তম পর্বে কঠোপনিষদ্ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখলেন শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ডাঃ বরুণ দত্ত।

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠান সূচী

জন্মাষ্টমী — ১৫ই আগষ্ট, মঙ্গলবার

আধ্যাত্মিক সভা — ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার, সন্ধ্যা ৭টা

মহালয়া — ২০শে সেপ্টেম্বর, বুধবার

নবরাত্রি দুর্গাপূজা — ২১ - ৩০শে সেপ্টেম্বর

২৫শে সেপ্টেম্বর (পঞ্চমী): সন্ধ্যায় নৃত্যানুষ্ঠান

২৭শে সেপ্টেম্বর (সপ্তমী): সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠান

২৮শে সেপ্টেম্বর (অষ্টমী): শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী বাবার তিরোভাব দিবস উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারা

২৯শে সেপ্টেম্বর (নবমী): দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর মহাপ্রসাদ

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা— ৫ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার

श्रीश्रीगणेश

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

दक्षयज्ञ में पिता के मुख से पतिनिन्दा सुनकर सती ने देहत्याग कर हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में मैनाक (मेना) के गर्भ से जन्मग्रहण किया और देवादिदेव महादेव के साथ उनका विवाह सम्पन्न हुआ। अनेक वर्षों तक संतान नहीं होने पर देवी पार्वती ने भगवान हरि-नारायण प्रीत्यर्थ एक महापुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया। एक वर्ष तक व्रत पालन करने पर भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए एवं अकस्मात् आकाश-मंडल में दिव्यरथ पर आविर्भूत होकर ऋषि-मुनि एवं देवताओं के समक्ष देवी-पार्वती को पुत्र-लाभ हेतु वरदान दिया। तब श्रीकृष्ण में से एक महाज्योति सम्पन्न दिव्य तेजपुंज निर्गत होकर पार्वती के गर्भ में प्रविष्ट हुआ। फलस्वरूप परवर्तीकाल में पार्वती ने एक दिव्य प्रभा सम्पन्न पुत्र को जन्म दिया। पार्वती के यही पुत्र 'गणेश' के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रकृत पक्ष में श्रीकृष्ण ही देवी पार्वती के पुत्र 'गणेश' के रूप में नित्य मंगलमय 'देव' रूप में आविर्भूत हुए। अयोनिसंभवा 'गणेश' ब्रह्माण्ड के अन्यतम एक अद्‌भूत सृष्टि हैं। पुराण में वर्णित है कि यथासमय पार्वती के पुत्रजन्म के पश्चात् देवतागण स्वर्ग, मर्त्य पाताल इत्यादि समस्त जगहों से नवजात दिव्य शिशु को देखने के लिए उपस्थित हुए। अन्यान्य देवताओं के साथ शनि भी आये। शनि की स्त्री ने शनि को अभिशाप दिया था कि वे जिधर भी दृष्टिपात करेंगे, उनका विनाश हो जाएगा। वही शाप स्मरण कर शनि के नवजात की तरफ दृष्टिपात न कर अधोमुख अवस्थान करने पर देवी पार्वती ने अपने पुत्र की तरफ देखने हेतु उनसे बार-बार अनुरोध किया। इसपर शनि ने अपने अभिशाप की गाथा देवी पार्वती से सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद भी पार्वती ने शनि से अपने नवजात की तरफ एकबार दृष्टिपात करने को कहा। तब शनि द्वारा शिशु की तरफ दृष्टिपात करते ही शिशु का सिर धड़ से अलग हो गया। यह संवाद भगवान विष्णु के पास पहुँचते ही भगवान ने इसकी व्यवस्था हेतु वहाँ पदार्पण किया। वे पथ में निद्रित एक श्वेत हस्ति देखकर शीघ्र ही अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से उसका मस्तक विच्छेद कर ले आए एवं गणेश के धड़ से युक्त कर दिया। देव गणेश समस्त जगत् में अनादृत न हो इसलिए देवताओं ने यह नियम बनाया कि सर्वप्रथम गणेश की पूजा नहीं करने पर उन सबों में कोई भी किसी पूजा को ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए प्रत्येक देवकार्य एवं पितृकार्य में सर्वप्रथम श्रीगणेश की पूजा होती है।

विविध पुराणों में 'गणेश' के संबंध में विभिन्न प्रकार की घटनाएँ है। जैसे ब्रह्मवैवर्त्त-पुराण में गणेश के एकदन्त के संबंध में ऐसा उपाख्यान है कि परशुराम ने जब त्रिसप्त (इक्कीस) बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर महादेव का साक्षात्कार करने हेतु मानस कैलाश आए तब शिव और पार्वती अंत:पुर में निद्रित थे एवं गणेश ने द्वाररक्षक के रूप में परशुराम को अंत:पुर में जाने से रोका, परिणामस्वरूप गणेश और परशुराम के बीच भीषण संग्राम आरम्भ हो गया। इस युद्ध में परशुराम के कुठाराधात से गणेश का एक दाँत समूल उत्पाटित (उखड़) हो गया। इसीलिए गणेश को 'एकदन्त' कहा गया। फिर स्कंदपुराण के गणेश खंड में ऐसा उपाख्यान है कि सिंदुर नामक एक दैत्य ने पार्वती के गर्भ में अष्टम मास में प्रविष्ट होकर गणेश का मस्तक काट दिया। इससे बालक की जीवनलीला समाप्त नहीं हुई क्योंकि गणेश दिव्यज्योति, दिव्यतेजयुक्त थे, परन्तु जन्मग्रहण के पश्चात् मुण्डहीन देह देखकर नारद ने दिव्य नवजात से जब इसका कारण पूछा, तो इस घटना से अवगत हुए। तब नारद ने उनसे स्वयं ही अपना मस्तक संग्रह करने को कहा। दिव्य बालक ने तब अपने तेज से गजासुर का मस्तक-विच्छेद कर अपने देह में संयुक्त किया (गजासुर एक विशालकाय असुर। महेश नामक एक नृपति नारद का अपमान करने पर नारद के अभिशाप से असुरयोनि में उत्पन्न हुए, तत्पश्चात् शिव ने

गजासुर का वध कर उसके चर्म का परिधान किया)। इसीलिए गणेश का नाम पड़ा गजानन। गणेश जन्म का एक और उपाख्यान है कि पार्वती देवी के दिव्य काया से गणेश की उत्पत्ति हुई। महादेव पार्वती को प्रसन्न करने हेतु एक गजमस्तक इस मस्तकहीन देह में संयुक्त किया। महादेव की करुणा से ये साथ ही साथ प्राणवंत हो उठे एवं माता पार्वती की प्रदक्षिणा कर पाद वंदना द्वारा अपनी महिमा एवं परम ज्ञान, भक्ति प्रकाशित किया। पार्वती और महादेव के आशीर्वाद से ये ब्रह्माण्ड के गणों के अधिपति, विघ्न विनाशक और सर्वसिद्धि दाता के रूप में गण्य हुए। ('गण' का अर्थ प्रमथगण, शिव के अनुचर, शिव के भृत्यगण। शिवपार्वती के अनुचरों को गण कहा जाता है। कई क्षेत्रों में शिव के वाहन नंदी को गणों का प्रधान कहा गया है। ये गण सर्वदा शिव और गणेश द्वारा शासित होते हैं। दुर्व्यवहार करने पर गणों को कैलाश से मर्त्यलोक में निर्वासित किया जाता है। एक अन्य विचार में गणदेवता या समस्त देवता के अधिपति है श्रीगणेश। गण-देवताओं की भी श्रेणियाँ एवं विभाग हैं। ये साधारणत: नौ भागों में विभक्त है। (१) आदित्य -१२ (२) विश्वदेव -१० (३) वसु - ८ (४) तुषित - ३६ (५) आभास्वर - ६४ (६) वायु या अनिल - ४९ (७) महाराजिक - २२० (८) साध्य - १२ (९) रुद्र - ११। ये सभी गणदेवता शिवानुचर; इनके अधिपति श्रीगणेश; ये सब गण पर्वत कैलाश में वास करते है; इनका स्थान देवताओं से निम्नस्तर में है।) श्रीगणेश सर्वदा ही तपस्या में मग्न रहते। तुलसी के अभिशाप से गणेश को विवाह करना पड़ा। गणेश की स्त्री का नाम 'पुष्टि'।

देवश्रेष्ठ श्रीगणेश की खर्वाकृति देह, त्रिनयन, चार हस्त एवं हस्ति सदृश मस्तक। एक हाथ में शंख, द्वितीय हाथ में चक्र, तृतीय हस्त में गदा और चतुर्थ हस्त में पद्म। इनका वाहन मूषक है। क्योंकि यह मूषक विश्वरूपधारी धर्म का अवतार है; महाबल और पूजा सिद्धि अनुकूल। अतएव श्रीगणेश हुए आद्या महाशक्ति के पुत्र, साक्षात् नारायण स्वरूप। यही है गणेश का शाश्वत रूप। श्रीगणेश का श्वेत-हस्ति का मस्तक प्रणव का प्रतीक। ये महाऐश्वर्यशाली, सर्वसिद्धि प्रदायक और मंगलमय। देवी पार्वती ने 'गणेश' रूप में अनंत ब्रह्मांडाधिपति पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को पुत्ररूप में प्राप्त किया था। 'श्रीगणेश' दिव्य की एक अनवद्य अति-आश्चर्यजनक सृष्टि। तंत्र शास्त्र के तत्त्वगत भाव में गणेश का कई प्रकार का रूप देखा गया है। उस में सर्वश्रेष्ठ है महागणेश रूप। यह दुर्गामहाशक्ति का गणेशरूप है। इस महागणेश की सात्विक, राजसिक एवं तामसिक आचार से पूजा की जाती है। सात्विक आचार सर्वश्रेष्ठ; यह निष्काम परहितकर पूजा। इस महागणेश की पूजा सिद्धपुरुष बिना किसी के अधिकृत नहीं है। इसके अलावा चतुर्भुज समन्वित श्वेत, पीत, लोहित एवं नील वर्ण के गणेश विग्रह की भी पूजा की जाती है। तत्त्वगत भाव में श्रीगणेश का स्वरूप योग का ऋद्धि-सिद्धि प्रदायक है। श्रीगणेश की स्त्री महालक्ष्मीस्वरूपा 'पुष्टि' अर्थात् साधक की शीलता रूपी सिद्धि का प्रकाश। सृष्टि के सर्वस्तर में गणेश का अधिष्ठान है। साधक के बोध-चेतना विकास पथ के प्रत्येक स्तर पर ही श्रीगणेश की कृपा स्पर्शलाभ से साधक का आध्यात्मिक जीवन पूर्ण से परिपूर्ण होता है।

श्रीगणेश का एक अन्य प्राज्ञरूप हमलोग देख सकते हैं श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासदेव के लिपिकार के रूप में। व्यासदेव महाभारत ग्रंथ रचनाकाल में लिपिकार के अभाव में चिंतित होकर ब्रह्मा के पास गये। तब ब्रह्मा ने व्यास देव को गणेश के शरणागत होने को कहा। व्यासदेव के गणेश के शरणापन्न होने पर गणेश एक ही शर्तपर महाभारत का लिपिकार बनना स्वीकार किया कि वे जब महाभारत लिखना आरंभ करेंगे उस काल में लेखन में किसी प्रकार का विराम नहीं होना चाहिए। व्यासदेव ने भी तब गणेश को प्रतिज्ञाबद्ध करा लिया कि किसी भी श्लोक को लिखने के पूर्व, श्लोक का सम्पूर्ण अर्थ अच्छी तरह से समझ-बुझकर लिखना होगा। इससे व्यासदेव को काफी सुविधा हुई। वे दुरूह श्लोक की रचना कर गणेश के लेखन को बीच-बीच में विलंब करा देते। एवं इस अवसर पर व्यासदेव नवीन श्लोकों का सृजन कर देते। इसीप्रकार समस्त महाभारत लिखा गया। महाभारत के प्राज्ञ लिपिकार श्रीगणेश महाभारत के योगशास्त्र को आध्यात्मज्ञान की दृष्पिभंगी में सर्वप्रथम स्फूरित किया। महाभारत के विभिन्न श्लोकों में जो निगूढ़ योगतत्त्व है श्रीगणेश की प्रज्ञा दृष्टि से वह सर्वप्रथम प्रस्फुटित हुआ, इसीलिए इस महाप्रज्ञा सम्पन्न पार्वती पुत्र श्रीगणेश को बारंबार हमलोग भक्ति-विनम्र प्रणाम करते हैं।

–हन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

–ॐ नमः श्रीगणपतये–

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्द्योपाध्याय

(१५)

तस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः।
कर्म्मणा वचसा चैव सर्व्वदाराधयेद् गुरुम्।।(५२)

– गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् नेति नेति इति वै श्रुतिः, (अतएव) कर्मणा, वचसा च एव सर्वदा गुरुम् आराधयेत्।।५२

गुरु बिना और कुछ नहीं है इसीलिए पद में नेति नेति उल्लिखित है। अर्थात् गुरु के अतिरिक्त अन्य जो वस्तुएँ जगत् में दृश्य हैं, वे गुरु के अलावा कुछ नहीं है। यही श्रुति कहती है। अतएव वाक् द्वारा उक्त अथवा इन्द्रियादि द्वारा कृत कर्म समूह सर्वदा गुरु आराधना द्वारा करना अर्थात् गुरु को हृदय में रखकर समस्त कर्म करना। (५२)

गुरोः कृपाप्रसादेन ब्रह्मा विष्णुः सदाशिवः।
सृष्टादिकम् समर्थास्ते केवलं गुरुसेवया।।५३

गुरोः कृपाप्रसादेन ब्रह्मा विष्णुः सदाशिवः केवलम् गुरु सेवयाते सृष्ट्यादिकम् (कर्म कर्त्तुं) समर्थाः।।५३

इच्छाद्वारा सृष्टि की कल्पना होती है, इच्छा द्वारा सृष्ट वस्तु रक्षित होती है एवम इच्छा द्वारा रक्षण की इच्छा नष्ट होकर सृष्ट वस्तु मन से अपसारित होकर उसका नाश होता है। तत्तत् इच्छा के अधिष्ठातृ देवता ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव हैं। गुरु ब्रह्म (कूटस्थ ब्रह्म) हैं भावमय पुरुष, उसी से समस्त भावों की उत्पति होकर इच्छा का कारण होता है। ब्रह्मादि देवतागण उनके अनुग्रह से भावान्वित होकर इच्छाबल से निज-निज कार्य करने में समर्थ होते हैं, इसीलिए गुरु ही समस्त कर्मों के एकमात्र मूल कारण – अर्थात् बुद्धिस्थान पर मन की स्थिति नहीं होने पर विक्षिप्त अवस्था में कोई कर्म संपादित नहीं होता है अतएव मन के संयम द्वारा बुद्धिस्थान पर स्थिति का प्रयोजन है एवं कूटस्थ ब्रह्म ही बुद्धि स्वरूप है।। ५३

देव किन्नर गंधर्व्वाः पितरो यक्षचारणाः।
मुनयोरपि न जानान्ति गुरुसुश्रूषणाविधिम्।। ५४

देवाः, किन्नराः, गंधर्व्वाः, पितरः, यक्षाः, चारणः, मुनयः अपि गुरुसुश्रूषणा – विधिं ना जानन्ति।। ५४

देव – स्वर्ग में अवस्थित होकर जो क्रीड़ा करते हैं वे ब्रह्म के साथ आनंदानुभूति से रहते हैं किन्तु ब्रह्म में लय होकर अवस्थित होने की कामना नहीं करते।

किन्नर – (किं – कुत्सित् ; नर –नर देह विशिष्ट पुरुष)

इनका अश्व के सदृश मुख एवं मनुष्य की तरह शरीर। ये पुरुष मनुष्य की काया विशेष होने पर भी अश्वगुण संपन्न (इच्छावश कार्य करते हैं इसीलिए अश्वगुण संपन्न – गीता की भूमिका देखो) अर्थात् बहु इच्छाधीन होकर सकाम भाव से कार्य करते हैं।

गंधर्वगण – (जिनका गायन ही धर्म, अर्थात् जो (ओंकार रूप) श्रुति अवलंबन किए हैं।

पितृगण – जो चंद्रलोक में निवास करते हैं। (अर्थात् सकामभाव में साधना द्वारा जिनकी चंद्रलोक में अवस्थिति है)।

यक्षः – देवयोनि विशेष धनरक्षक। जो पुरुष जगत् के ऐश्वर्यलाभ हेतु धर्म कर्म करते है।

चारण – श्रुति पाठक। जो व्यक्ति वाह्यभाव से ब्रह्म के श्रुतिपाठ में रत है, इसीलिए उसकी अधमभाव में पूजा होती है। (स्तुतिर्जपोहधमो भावः)।

मुनि – जो मन को जानते हैं एवं ब्रह्म को जानने हेतु रोधपंथा अवलंबन द्वारा संयम-साधन में रत हैं।

इनमें से कोई भी गुरु सुश्रूषणा विधि नहीं जानते; अर्थात्, देवभावापन्न पुरुष की जबतक आनन्दानुभूति (देव शब्द का अर्थ २४ वे श्लोक में देखें) है, तब तक ब्रह्मसेवा सम्यक भाव से नहीं होती; क्योंकि जगत् संपर्क में आनंद नहीं है एवं ब्रह्म के संग आनंद है यह वे समझते है इसीलिए आनंदानुभूति हो रही है, इसीलिए उनका जगत् संपर्क नष्ट नहीं होता। अतएव उनकी गुरुसुश्रूषणा सम्यक रूप से नहीं है एवं सुश्रुषणा सम्यकभाव से होने पर, एकमात्र ब्रह्मभाव ही प्रबल रहता है, तब आनंदशून्य जागतिक भाव नहीं है, इसीलिए ब्रह्मभाव में शान्ति की अनुभूति होती है। किन्नर का फल-कामना सहित साधन हो रहा है इसीलिए वह ब्रह्मसाधना का फल नहीं पा रहा है, अर्थात् फल की इच्छा वर्जित होने पर ब्रह्मलाभ सचमुच होता है। (५१ श्लोक देखो)। गंधर्वगण वीणा यंत्र वादन में एवं ओंकार ध्वनि

श्रवण में लीन रहते हैं। (ओंकार रूप वीणायंत्र में शर योजना कर ब्रह्म को लक्ष्य कर स्वर निक्षेप से जो ध्वनि उत्पन्न होती है। यथा ध्यान बिन्दुपनिषत् – प्रणव धनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते)। इसीलिए उनलोगों की प्रकृत गुरुसेवा नहीं होती, ध्वनि पर लक्ष्य न रख कर गुरुध्यान में लीन रहने पर ही यथार्थ गुरुसेवा होती है। (ओंकार गीता ३२,३३ श्लोक देखें)। पितृगणों की गुरु सूक्ष्म मूर्ति में अवगति न होने से उनका चंद्रलोक में बसेरा हैं एवम् सूर्यलोक में गति नहीं होने से उनसबों से प्रकृत गुरुसेवा नहीं होती। यक्षगण जगत् के ऐश्वर्य के प्रति लक्ष्य रख कर गुरुसेवा करते हैं, इसीलिए उनकी गुरुसेवा नहीं होती। चारण गण वाह्यभाव से जप एवं स्तुति पाठ करते हैं, इसीलिए उनसबों को अधमपूजक कहते हैं, एवं वे लोग वास्तविक रूप से गुरु सेवक नहीं हैं, परन्तु जप व स्तुति पाठव्रती। मुनिगण वाह्य चिंतन रोध द्वारा मौनव्रती होते हैं इसीलिए वे भी प्रकृत रूप से ब्रह्मभावापन्न नहीं होते, क्योंकि ब्रह्मभावापन्न होने पर रोध की आवश्यकता क्यों होगी? जो ब्रह्मभावापन्न वे सर्वत्र ब्रह्म को ही देखते हैं। इसीलिए उनके लिए अवस्थाच्यूति का कोई कारण नहीं होता। (गीता ११ वाँ अः, २२ और ४८ श्लोक देखो)।। ५४

...क्रमशः

(कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमा सर्वाणी

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न ३९ : 'गायत्री' मंत्र का अर्थ क्या है? 'गायत्री' देवी और 'गायत्री' मंत्र दोनों क्या एक है?

उत्तर : गायत्री मंत्र ऋग्वेद का पवित्रतम मंत्र है। गायत्री द्विजगणों का उपास्य सिद्ध-चिन्मय मंत्र विशेष है। प्रत्येक सदाचारी निष्ठावान ब्राह्मण को प्रातः, मध्याह्न तथा सायाह्न में इस मंत्र द्वारा सूर्य को मन में ध्यान करना चाहिए। प्रसिद्ध मंत्र इस प्रकार है –

'ॐ भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धीयो यो नः प्रचोदयात् ॐ।'

-(ऋग्वेद, ३य मण्डल, ५म अध्याय, ६२ सूक्त)

यह मंत्र सावित्री (सूर्य) के उद्देश्य से लिखा गया है। गायत्री मंत्र का अर्थ - 'सर्वलोक प्रकाशक सर्वव्यापी इस पूर्णमण्डल जगत्-प्रसविता परम देवता के वरणीय ज्ञान और शक्ति का ध्यान करता हूँ, जिन्होंने हमें समस्त बुद्धिवृत्ति प्रेरण की है। देवीरूप में यही सविता ब्रह्मा की स्त्री एवं चतुर्वेदों की माता है।'

लिंग पुराण में है - श्वेतकल्प में महादेव से श्वेतवर्णा गायत्री देवी आविर्भूत हुई थी। फिर मत्सपुराण में वर्णित है - महाप्रजापति ब्रह्मा एक बार जप में निरत थे। उसी समय उनकी पवित्र देह भेद कर अर्द्ध-स्त्रीरूप और अर्द्ध-पुरुषरूप प्रादुर्भूत हुए। यही स्त्रीरूपार्द्ध 'शतरूपा' नाम से प्रसिद्ध हुई। यह शतरूपा ही सावित्री, गायत्री, सरस्वती और ब्रह्माणी नाम से विख्यात हुई। देवी सरस्वती, जो महासरस्वती रूप में दुर्गादेवी की अंश सम्भूता है, वे ब्रह्मा की ज्येष्ठ पत्नी और वेदमाता गायत्री, ब्रह्मा की कनिष्ठा स्त्री है।

गायत्री मंत्र चिन्मय; गायत्री मंत्र ही गायत्री देवी का पूजित तत्त्वरूप है। गायत्री पाठ से मनुष्य त्राण पाता है। गायत्री की शक्ति से विश्वामित्र ऋषि ब्रह्मर्षि हुए थे। जो इस मंत्र का पाठ अथवा गायन करते है वे त्राणप्राप्त होते हैं इसीलिए इस मंत्र का नाम 'गायत्री' है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यगण वेद-पारदर्शी आचार्यों द्वारा गायत्री मंत्र में दीक्षित होते है। तब उनका पुनर्जन्म होता है एवं तब वे द्विज कहकर अभिहित होते हैं। गायत्री मंत्र की त्रिसंध्या में पवित्रभाव से जप द्वारा उपासना करनी पड़ती है। गायत्री एक धारा से ब्रह्मा, विष्णु, शिव और तीन वेद है। गायत्री गीतकारीजनों का त्राण करती है इसीलिए 'गायत्री' नाम से अभिहिता होती है। क्रियायोग साधना में गायत्री-मंत्र न्यास प्राणायाम सहयोग से करना पड़ता है। श्रीश्रीप्रणवानन्द गिरि महाराज लिखित 'सप्तश्लोकी' प्रणव-गीता से इसका कुछ आभास मिलता है। त्रिसंध्या में गायत्री में ब्रह्माणी, वैष्णवी और रुद्राणी शक्ति की आराधना की जाती है। इन प्रत्येक तीन दैवी शक्तियों का अलग-अलग तत्त्व है। इन तीन शक्ति-तत्त्व के समन्वय की पूर्णज्ञानरूपा हुई देवी गायत्री।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

मान्धाता और बिन्दुमती

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नाम के एक राजा थे। युवनाश्व की पत्नी का नाम था गौरी। राजा परम धार्मिक थे। उन्होंने अश्वमेधानुष्ठान और अन्यान्य बहुविध प्रधान-प्रधान यज्ञ किए थे। तथापि राजा सन्तान के मुखदर्शन जनित सुख-सम्भोग से वंचित थे। उसी कारण से उन्होंने अमात्य के हस्त में राज्यभार समर्पण कर योग-साधना की इच्छा से मुनियों के आश्रम में वनवास का आश्रय लिया। कालक्रम में मुनियों ने युवनाश्व से संतुष्ट होकर पुत्र प्राप्ति के यज्ञारम्भ किया। भृगुनन्दन युवनाश्व के पुत्रलाभार्थ एक यज्ञ किया। मध्यरात्रि में यज्ञ निवृत्त होने के पश्चात् मुनियों ने मन्त्रपुत एक कलशीपूर्ण जल वेदी के ऊपर रखकर सोने चले गये। राज-महिषी बिन्दुमती उस मन्त्रपूत जल का सेवन कर इन्द्र के सदृश एक पुत्र प्रसव करेंगी यह सोचकर यज्ञवेदी के ऊपर कलशी रखकर महर्षिगण निद्रा लेने गये। ऐसे समय में पिपासा से शुष्ककन्ठ युवनाश्व ने उस जल का पान कर गर्भधारण किया। मुनियों ने जाग्रत होकर देखा कि कलशी जलशून्य है। तब युवनाश्व की स्वीकारोक्ति सुनकर मुनियों ने कहा – ''आपके पुत्रोत्पत्ति के लिए ही यह तप:सिद्ध जल रखा था। जलपान के फलस्वरूप आप ही पुत्र प्रसब करेंगे किन्तु गर्भधारण क्लेश से मुक्ति पाऐगें।'' शतवर्ष पूर्ण होने पर युवनाश्व के वामकूक्षि भेद कर एक सूर्यतुल्य तेजस्वी पुत्र निर्गत हुआ। लेकिन मातृस्तन के दुग्ध अभाव में पुत्र क्या पान करके जीवित रहेगा, राजा यह सब चिन्ता कर रहे थे, उसी समय इन्द्र ने वहाँ उपस्थित होकर कहा, ''यह बालक मुझे धरण करेगा'' – ''धास्यति मामयं'' अर्थात्, मेरे सहारे जीवित रहेगा। इसीलिए देवताओं ने उसका नाम रखा 'मान्धाता'। इन्द्र ने तब बालक के मुख में अपनी अंगुलि प्रविष्ट कर देने पर बालक उस अंगुलि को चुसने लगा। मान्धाता इन्द्र के अंगुलि से निर्गत दुग्धधारा पान कर द्वादश दिन के मध्य द्वादशवर्षीय बालक के न्याय हृष्टपुष्ट हो गए। इन्द्र तुल्य बलशाली मान्धाता ने एकदिन में ही समग्र पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। इन राजचक्रवर्ती मान्धाता ने अश्वमेध और एकशत राजसूय यज्ञ सम्पन्न कर सुवर्णमय रोहित मत्स समस्त ब्राह्मणों को प्रदान किए। दिग्विजय में बहिर्गत होकर लंकाधिपति रावण अयोध्याधिपति मान्धाता का परिचय पाकर उनके सहित युद्ध में प्रवृत्त हुए। उभय ही तुल्य बलशाली होने के कारण किसी की भी जय पराजय नहीं हुई। परिशेष में गालब और पुलस्त्य ऋषिद्वय के मध्यस्थता में उनके मध्य सख्यता स्थापित हुई।

मान्धाता के राजत्वकाल में एकबार दानवगण प्रबल होकर समस्त लोगों पर अत्याचार करने लगे। तब मान्धाता ने भगवान नारायण के दर्शन हेतु एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। विष्णु ने इन्द्ररूप धारण कर उस यज्ञ में मान्धाता को दर्शन दिया एवं क्षात्र-घर्म के विषय में विभिन्न प्रकार के उपदेश प्रदान किया। ब्रह्मवेत्ता उतथ्य ने मान्धाता को राजधर्म के विषय में उपदेश प्रदान किया। वशिष्ठ ऋषि ने मान्धाता को फाल्गुन मास की शुक्लपक्ष की एकादशी की आमलकी-व्रत का उपदेश प्रदान किया। एकबार मान्धाता के राज्य में अनावृष्टि एवं दुर्भिक्ष उपस्थित होने पर मान्धाता ने अंगिरा ऋषि से इसका कारण पूछा। अंगिरा ने कहा कि मान्धाता के राज्य में एक शूद्र ने तपस्याव्रत का पालन किया, इसीलिए राज्य में अनावृष्टि का प्रकोप हुआ। यह कहकर अंगिरा ने मान्धाता से उस शूद्र का वध करने को कहा। किन्तु मान्धाता द्वारा इसको अस्वीकृत करने पर अंगिरा ने तब उसे श्रावण शुक्ला-एकादशी को पद्माव्रत करने का उपदेश प्रदान किया। वसुहोम नामक एक राजा ने मान्धाता से दण्डनीति की उत्पत्ति के विषय का वर्णन किया। सूर्य के उदय से लेकर अस्त पर्यन्त समुदय स्थान मान्धाता के अधिकार में था। विष्णु के अंशसंभूत मान्धाता अजेय एवं अमित तेजस्वी थे। शास्त्रानुसार गोदान कर मान्धाता ने स्वर्ग की प्राप्ति की।

राजा शशबिन्दु की कन्या बिन्दुमती (चैत्ररथी) इनकी पत्नी थी । बिन्दुमती अतिशय धर्मपरायणा और पतिपरायणा थी। वे अपने अयूतसंख्यक भ्राता की ज्येष्ठा भगिनी थी। उस समय भूलोक में उनके तुल्य सौन्दर्यशालिनी और कोई नहीं था।

बिन्दुमती के गर्भ से पुरुकुत्स, मुचुकुंद एवं अम्बरीष ने जन्म ग्रहण किया। पुरुकुत्स आदि तीन पुत्रों के अतिरिक्त मान्धाता की पचास कन्याएँ भी थी। उन समस्त कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ संपन्न हुआ। देवी-पुराण के अनुसार मान्धाता तृतीय मन्वंतर में इंद्र बने।

मान्धाता ने जब समग्र पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर देवलोक पर अधिकार करने हेतु उद्यत हुए, तब इन्द्र उससे अतीव भयग्रस्त होकर मान्धाता से बोले, ''आप यथार्थ में समस्त पृथ्वी के अधिकारी नहीं हो सकते। सम्पूर्ण वसुधा को जीते बिना आप किस आधार पर स्वर्गविजय के विषय में सोचा है?'' तब मान्धाता ने देवराज से पूछा, ''इस वसुंधरा पर ऐसा कौन है जिसने मेरा आधिपत्य स्वीकार नहीं है?'' इन्द्र ने कहा कि मधुपुत्र लवणासुर ने मान्धाता की अधीनता स्वीकार नहीं की है। तब मान्धाता ने लवणासुर को पराजय करने हेतु प्रस्थान किया। किन्तु दुर्भाग्यवस लवण के हाथों मान्धाता निहत हुए। (मधु दैत्य का पुत्र था लवणासुर। मधु ब्राह्मणभक्त और आश्रितवत्सल थे। महादेव ने प्रसन्न होकर अपने शूल के सदृश एक शूल इन्हें उपहार स्वरूप प्रदान कर इनसे कहा था, मधु देव-ब्राह्मण का विरोध न करने तक यह शूल उनके पास रहेगा एवं यह शूल शत्रु को भस्म कर पुनः उनके पास ही वापस आ जाएगा। मधु ने तब महादेव से प्रार्थना की कि वह शूल चिरकाल तक उनके वंश के अधीन रहे। महादेव ने इसपर असहमति जताते हुए कहा कि मधु का पुत्रों में से एकजन इस शूल का अधिकारी होगा। मधु पुत्र लव, उस शूल का अधिकारी हुआ)।

(*सहायक ग्रन्थ - विष्णुपुराण और अन्यान्य पुराण*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (३७) : श्रीश्रीबाबा के अलौकिक शक्ति के संबंध में आशीषदा (आशीष बनर्जी) से श्रुत एक अन्य आश्चर्यजनक घटना का वर्णन यहाँ कर रहा हूँ। आशीषदा ने कहा – ''हमारे दादा (श्रीश्रीबाबा) की हठात् इच्छा हुई दिल्ली जाने की, किसी विशेष कारण वश। जो भी हो निर्दिष्ट तिथि को सायंकाल में संभवतः पूर्वा एक्सप्रेस से दिल्ली जाने का दिन आ गया। मैंने दादा से कहा कि, ''कार्यालय से अवकाश से कुछ पहले आकर आपको रेल पर चढ़ाने जाऊँगा''- परन्तु दादा किसी भी प्रकार राजी नहीं हुए। बहुत प्रयास के बावजूद दादा को राजी नहीं कराया जा सका। फिर भी दादा के मना करने के बाद भी निर्दिष्ट तिथि को मैं कार्यालय से थोड़ा पहले निकलकर हावड़ा स्टेशन पहुँच गया। उस समय कई दिनों से दादा को खैनी खाने का शौक हुआ था। इसीलिए मैं उनके लिए अच्छी खैनी की डिब्बी खरीद कर उसमें खैनी और चूना डालकर ले गया। किन्तु आश्चर्यजनक घटना यह था कि, निर्दिष्ट समय पर ट्रेन विशेष प्लेटफार्म पर खड़ी थी, परन्तु जहाँ पर यात्रियों के नाम की सूची टंगी थी उसमें पूरे खोज के पश्चात् भी दादा का नाम एवं सीट-नंबर अनुपलब्ध था। उनके साथ जो भद्रपुरुष जा रहे थे उनका भी नाम एवं सीट-नंबर अप्राप्त रहा। थकहार कर हताश एवं बहुत अभिमान के साथ घर लौट आया। नियत तिथि को जब दादा लौट आये तो उसके दूसरे दिन उनका दर्शन करने गया। मुझे देखते ही दादा अति उत्साह पूर्वक कहने लगे, ''आशीष खैनी तो दो, वह खाने के लिए मन बहुत बेचैन है।'' मैं आनंद में आत्महारा दादा के चरण प्रदेश में शरणागत हो गया।

प्रसंग (३८) : हम सबों के आशीष बनर्जी के घर पर किसी एक दिन छोटी भेटकी मछली की तरकारी बन रही थी। हठात् आशीषदा के मन में यह विचार उठा कि दादा छोटी भेटकी मछली की सब्जी बहुत प्रेम से खाते थे। इसीलिए एक छोटी साबूत भेटकी मछली की सब्जी टिफिन में भरकर दादा (श्रीश्री बाबा) के घर जाकर भाभी के पास दो मंजिले पर रसोईघर में रख आया। तत्पश्चात् प्रतिदिन की तरह दादा जब मध्यान्न में भोजन हेतु बैठे, तब भाभी द्वारा परोसी हुई मछली की सब्जी को अनेक आग्रह के बावजूद भी खाने से मना कर दिया। अंत में बोल उठे कि, ''आशीष ने जो भेटकी मछली की तरकारी मेरे लिए लाया है वह मुझे दो।'' तथा दादा ने उसे अति आनंद से खाया।

यहीं समझा गया भक्त के प्रति भगवान का प्रेम।

प्रसंग (३९) : गुरुमहाराज ने नगारा बजानेवाला को ऋणमुक्त कर दिया – हमलोगों के आश्रम (अखण्ड महापीठ) में जैसी दुर्गापूजा होती है, वैसी ही दुर्गोत्सव बाबा के घर पर भी होता था। किसी एक दुर्गापूजा के कई दिन पहले बाबा ने अग्रिम के रूप में १०० रुपये देकर अंशुमान के हाथ से नगारा बजाने वाले को भिजवाया। इस ढोल बजाने वाले का घर संभवतः डोमजूड़ या बड़गाछिया था। तथा प्रतिवर्ष दुर्गापूजा में वही ढोल बजाता था। हठात् दो एक दिन पहले बाबा ने अंशुमान को अग्रिम १०० रुपये वापस

लेने के लिए उसी नगारा बजानेवाले के पास भेजा। अंशुमान को इसका कोई कारण समझ नहीं आया। निरुपाय अंशुमान बाबा के आदेशानुसार उस ढोलबजानेवाले के पास जाकर वह अग्रिम १०० रुपये वापस ले आया। परन्तु इसी बीच एक घटना घटी। उदय नारायण जंसन, बड़गाछिया, डोमजूड़ एवं माकड़दह के लोगों को हावड़ा आने के लिए दासनगर स्टेशन पार कर जाना पड़ता था। एवं दासनगर रेल स्टेशन पर जो रेलवे-ओवर-ब्रीज है उसके नीचे से होकर ही सभी वाहनों को गुजरना पड़ता था। तथा हमेशा यह देखा जाता कि दूरगामी बसों के छतों तक लोग भरे रहते। सब लोग छत पर बैठ जाते। किन्तु यहाँ पर एक समस्या थी कि कोई यदि खड़ा हो जाता तो उसका सिर ओवर-ब्रीज के निचले हिस्से से टकराने के कारण, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी थी। सावधान कराने के बावजूद ऐसी घटना अक्सर घट जाती। हमलोगों का ढोल-वादक भी ठीक ऐसी ही एक घटना में दुर्गापूजा के दो एक दिन पूर्व काल-कवलित हो गया। हमलोगों के 'दादा' को इस घटना का पूर्व-ज्ञान था इसीलिए इस जन्म हेतु नगारा-वादक को १०० रुपये से ऋण-मुक्त कर गये। (आशीषदा की उपस्थिति में ही यह घटना घटी थी)।

प्रसंग (४०) : श्रीश्रीदुर्गाप्रसन्न परमहंसदेव के सान्निध्य में श्रीश्रीबाबा –

श्रीश्रीदुर्गाप्रसन्न परमहंसदेव के साथ हमलोगों के श्रीश्रीबाबा का आत्मिक संबंध था। श्रीश्रीबाबा कहते थे कि उन्होंने बहुत दिन श्रीश्रीदुर्गाप्रसन्न परमहंसदेव के सान्निध्य में बिताया है। एकबार वे दोनों गंगासागर गये थे। गंगासागर में दोनों लोगों द्वारा गंगास्नान करने के दौरान एकबार श्रीश्रीबाबा ने अकस्मात् श्रीदुर्गाप्रसन्न परमहंसदेव के शरीर का कौपीन-वस्त्र शरीर से खींचकर जल में फेंक दिया। इस घटना से परमहंसदेव बिना विचलित हुए तैरकर जल में से उस वस्त्र को निकाल लिए, इस घटना से दोनों के मध्य हास्य विनिमय हुआ। तत्पश्चात् पुनः स्नान समय श्रीश्रीबाबा ने उनसे कहा, ''वह देखो! जलस्रोत में सामने एक आम्रफल बहता जा रहा है; उसे पकड़िए तो।'' परमहंसदेव ने सचमुच एक पका हुआ आम्रफल जल में बहते हुए देखा। स्मितहास्य उन्होंने उस पके हुए आम्रफल को पकड़ने हेतु बहुत प्रयत्न किया परन्तु असफल रहे। उन्होंने देखा कि जलस्रोत में एक ही जगह वह आम्रफल ऊपर-नीचे हो रहा है। किन्तु बहुत प्रयास क बावजूद भी जब वे उसे पकड़ने में असफल रहे तो उन्होंने अपने बंधु के समीप अपनी हार स्वीकार किया। तथा अति प्रसन्न होकर महाआनन्द में उस समय श्रीश्रीबाबा को गले लगा लिया। उन्होंने कहा – ''साबास!'' उस के बाद दोनों आलिंगनबद्ध होकर आपस में प्रेम का आदान-प्रदान किया। उधर आम्रफल गंगाजल में अंतर्हित हो गया, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इस संदर्भ में परमहंसदेव समझ गये कि अपने योगैश्वर्य बल से श्रीश्रीबाबा ने इस लीला की रचना की है। श्रीश्रीबाबा पूर्णसिद्ध और आप्तकाम हो गये है। यह जानकर श्रीश्रीपरमहंसदेव ने अद्भूत आनंद पाया। इसके बाद स्नानोपरांत दोनों महापुरुष अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। इस घटना के पश्चात् दोनों व्यक्तियों के बीच संबंध पहले से भी सुमधुर हो गया। इसी प्रकार श्रीश्रीसरोज बाबा महात्माओं के संग रसपूर्ण लीला करते थे।

इस प्रसंग में कहना उचित होगा कि प्रकृत सत्संग हेतु श्रीश्रीदुर्गाप्रसन्न परमहंसदेव के पास श्रीश्रीबाबा बहुत पहले से ही आवागमन करते थे। परमहंसदेव की आयु श्रीश्रीबाबा से बहुत अधिक थी। जब श्रीश्रीबाबा ने प्रथम उनका सान्निध्य प्राप्त किया तब श्रीश्रीबाबा सिद्ध नहीं थे। बाद में संसार से अचानक अंतर्हित होकर हिमालय में अवस्थित व्यासपीठ गये। १४ वर्ष के बाद पुनः अचानक गुरु निर्देश से वे कुछ काल हेतु लोकालय लौट गये। उसी दौरान यह लीला घटी। उस अद्भूत आश्चर्यजनक लीला के माध्यम से श्रीश्रीसरोजबाबा ने श्रीश्रीदुर्गाप्रसन्न परमहंसदेव को यह दिखा दिया कि वे भी परमहंस हो चुके हैं। इस घटना के माध्यम से एक परमहंस ने दूसरे परमहंस का परिचय प्राप्त किया। यह विषय जानकर श्रीदुर्गाप्रसन्न परमहंसदेव आनंदित हुए क्योंकि वे हृदय से चाहते थे कि श्रीश्रीबाबा पुनः अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो। उन्होंने पहले श्रीश्रीबाबा से कहा था कि वे श्रीश्रीबाबा के सद्गुरु नहीं है। समय आने पर श्रीश्रीबाबा के साथ उनके सद्गुरु की मुलाकात होगी। श्रीश्रीदुर्गाप्रसन्न परमहंसदेव की वाणी श्रीश्रीबाबा के जीवन में सत्य साबित हुई।

उपर्युक्त घटना मैंने श्रीश्रीमाँ सर्वाणी से सुना। श्रीश्रीमाँ श्रीश्रीबाबा के अतुल योगैश्वर्य के संबंध में अवगत हुई एवं इस प्रकार की कई घटनाओं का वर्णन श्रीश्रीबाबा ने श्रीश्रीमाँ से किया। *...क्रमशः*

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्री अमरेन्द्र चन्द्र श्याम की कृति 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्री किशोरी मोहन का जीवन ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्'। इसके अंतर्गत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

पत्र संख्या (६)

ॐ

प्रणवाश्रम, काशीधाम
१३ माघ, १३४५ बं

श्रीमान राजा – परम् कल्याणीयेषु,

तुम्हारा पत्र सही समय पर प्राप्त हुआ है। मुक्तात्मा की चरम अवस्था कैसी होती है, तुमने प्रश्न किया था, उसी का उत्तर दे रहा हूँ।

यथा– श्रुति में उक्ति है – ब्रह्मज्ञ ब्रह्मैव भवति। अर्थात् ब्रह्मज्ञ पुरुष ब्रह्म ही होते हैं। सर्वप्रथम ज्ञानोदय से जीव ब्रह्मज्ञ होता है, तत्पश्चात् वह ब्रह्म हो जाता है। प्रथमावस्था में वे ब्रह्म को जानते है इसीलिए उन्हें ब्रह्मज्ञ कहा जाता है। फिर ज्ञान का क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगता है। अविद्या जीव को आवृत रखती है इसीलिए जीव स्वयं को ब्रह्म नहीं समझता है। उसकी स्थूल देह एवं सूक्ष्म देह पर मैं, मेरा इत्यादि अभिमान रहने से सुख-दुःख का ज्ञाता होकर निज को सुखी एवं दुःखी समझता है। आत्मतत्त्व से अवगत होने पर वे सुख या दुःख से अभिभूत नहीं होते है। आत्म-प्रभाव से उनका राग-द्वेष आदि तिरोहित हो जाते हैं एवं अंतरस्थ रिपुगण वशीभूत हो जाते हैं। उनकी कामना, वासना तथा संकल्प आदि भी तिरोहित होते हैं। तब वे अति निर्मल, स्थिर, धीर, शान्त और समभाव धारण करते है। इन समस्त अवस्था संपन्न होने पर भी उन्हें ब्रह्मज्ञ कहा जाता है। तो उन्हें ब्रह्म कब कहा जाता है? इस संबंध में श्रुति में वर्णित है, यथा - यदा असत् सर्वं आत्मैव भवेत्, किं केन पश्येत्, किं केन जिघेत्, किं केन स्पर्शेत्, किं केन शृणुवात्, किं केन मन्येत्। येन सर्वमिदं विज्ञात तं केन विजानीयात्। विज्ञातारं और क्यों विजानीयात्। इसका यही अर्थ है – जब समस्त (समग्रजगत्) ही उनके समक्ष आत्मा रूप में प्रतिभात होता है, तब किसके द्वारा वे किसे देखेंगे, किस को आघ्राण करेंगे, किसे स्पर्श करेंगे, किसे श्रवण करेंगे, किसे मनन करेंगे? जो समस्त को जानता है, (वे ही आत्मा) उसे किसके द्वारा जानेंगे। जो इन समग्र के विज्ञाता है, उसे अब किसके द्वारा जानेंगे। ज्ञाता एवं ज्ञेय ये उभय वे ही हैं। यहाँ श्रुति का मर्म यही है – वे समग्र जगत् को आत्ममय देखते हैं जड़ वस्तु के रूप में उनके पास कोई स्वतंत्र सत्ता वर्तमान नहीं रहती। वे तब समग्र जगत् को 'मैं' के रूप में जानते हैं। तब सर्वत्र सर्वावस्था में एवं सर्वकाल में ही ज्ञान प्रतिभात होता है। अभेदभासते नित्यं वस्तुभेद न भासते। अर्थात् तब अभेद भाव में उद्भासित होता है, वस्तु भेद नहीं रहता। उस समय क्या वे जगत् दर्शन नहीं करते? इसका उत्तर यही है – इस क्षण में जगत्-दर्शन कर रहे हैं, दूसरे क्षण अब जगत् है ही नहीं। अभी देखते है स्थूल-सूक्ष्म देह है, दूसरे क्षण कुछ भी दृश्य नहीं है। उनकी कार्य करने की भी इच्छा नहीं और निवृत्ति की भी इच्छा नहीं। जब वे कार्य नहीं करते हैं, तब वे जैसे परमात्मा हैं, कार्यकाल में भी वे वैसे ही परमात्मा हैं। वे अरण्य या गिरिगुहा में अवस्थान करे या गृह में वास करें वे समभाव में सर्वत्र ही परमात्मा। एकमेवाद्वितीयम्। तब वे ब्रह्म ही हो जाते है। देहांत पर्यन्त उनका भी कर्मफल भोग रहता है। वे संपूर्ण निर्लिप्त भाव में भोग करते हैं। देहांत में उनके सर्व कर्मफल का अंत होता है। प्रारब्ध कर्मफल का अंत भोग द्वारा तथा संचित कर्मफल का नाश ज्ञान द्वारा होता है। अविद्या नाश होने पर भी उसका किंचित लेश अवशिष्ट रहता है। उस के द्वारा प्रारब्ध कर्मफल का भोग होता है। देहांत काल में वह भी विनष्ट हो जाता हैं। तब वे संपूर्णरूप में ब्रह्मभाव में अवस्थान करते हैं। काया में प्राण रहने पर भी उन्हें जीवन्मुक्त कहते है, देहांत में उन्हें निर्वाण या कैवल्य प्राप्त कहते हैं। इसका कारण यह है कि देह रहने पर सामान्य अविद्या का लेश रहने पर भी, अविद्या नष्ट ही समझी जाती है। एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नान्यास्ति किंचन। अर्थात्, एक मात्र अद्वैत-ब्रह्म ही है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ कहकर कुछ नहीं है। अतएव ब्रह्म तत्त्व प्रतिपन्न होता है। एकमेवाद्वितीयमिति। देहत्याग के पूर्व उनके सम्पूर्ण ऐश्वर्य का उदय नहीं होने पर भी देहांत के समय ये सब उदित होते हैं। श्रुति कहती है – स स्वराट भवति, अनन्याधिपति भवति। अर्थात्, उसका स्वकीय राज्य स्थापन होता है। तदुपरि कोई अधिपति नहीं रहता। वे तब स्वयं ही प्रधान होते हैं। किसी के समक्ष उनकी अधीनता नहीं रहती। उन्हें चिरसुख चिरशांति भोग प्राप्त होती है। अतएव

एकमेवाद्वितीयमीति।

इति–

श्रीकिशोरी मोहन

उपर के पत्र के साथ निम्न पत्र भी संलग्न है –

१३ माघ १३४५

पत्र संख्या (६ - १)

श्रीमान राजा - परम् कल्याणीयेषु,

अति संक्षेप में मैंने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया। इसी से सब कुछ समझ जाओ। अविद्या के उपर विश्वास मत करना। इसका अणुमात्र भी छिपे रहने पर उससे पुनः अविद्या वृक्ष उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए कहता हूँ कि देहांत पर्यन्त साधन करना होगा। आप्रयानात् तथा हि दृष्टम्। मेरा तथा श्रीमान रुद्र का शरीर एक समान है। तुम मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो और श्रीमान अमरेद्र को, श्रीमान क्षितिशचन्द्र सेन तथा श्रीमान क्षितिशचन्द्र राय चौधरी को मेरा आशीर्वाद प्रदान करना। तुम सब एकत्रित बैठकर तत्त्व आलोचना करो एवं आनन्द भोग करो। सर्वदा अद्वैत भावना का चिन्तन करो। वैषयिक सर्वकार्य के मध्य भी अपना अद्वैत भाव विस्मृत नहीं होने देना। एकमेवाद्वितीयमिति।

इति–

श्रीकिशोरी मोहन

–हिन्दी अनुवादः **मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द**

कृष्ण कथा

भक्तिमती भानुमती

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

यदुवंशीय 'भानु' नाम्नी एक यादव कन्या थी भानुमती। षट्पुर जय के पश्चात् श्रीकृष्ण अन्यान्य यादवगण के साथ पिण्डारक तीर्थ में रासलीला में मत्त हुए। तब 'बारूणी' उत्सव चल रहा था। इसी समय 'निकुम्भ' नामक एक दैत्य ने भानुमती का हरण कर लिया। कन्या के रोदन सुनकर वसुदेव तथा उग्रसेन प्रतिरोध करने के लिए गमन किया किन्तु वे कुछ भी देख नहीं पाए। उन्होंने इस घटना से श्रीकृष्ण को अवगत करवाया। सुनने के साथ-साथ श्रीकृष्ण और अर्जुन ने वहाँ से प्रस्थान किया एवं व्रजपुर के समीप निकुम्भ के साथ भीषण युद्ध हुआ। वहाँ से निकुम्भ भानुमती को लेकर गोकर्ण एवं तत्पश्चात् षट्पुर चला गया। तब प्रद्युम्न और अर्जुन के साथ पुनः युद्ध हुआ। परिशेष में श्रीकृष्ण ने दैत्य का वध कर दिया। देवर्षि नारद ने बताया कि रैवत-स्थान पर किसी समय में दुर्वासा मुनि ने भानुमती के प्रति असंतुष्ट होकर शाप दिया कि वह अपहृता होकर शत्रु-हस्त में पतित होगी। पश्चात् में नारद के कहने पर दुर्वासा मुनि ने भानुमती को निरपराध जानकर, नारद के परामर्श से उसे -'शोभन स्वामी प्राप्त हो' ऐसा वर प्रदान किया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन और प्रद्युम्न की सहायता से भानुमती को निकुम्भ दैत्य के हस्त से उद्धार किया। तदनन्तर भानुमती के पिता ने श्रीकृष्ण के परामर्श से भक्तिमती भानुमती का पंचम पाण्डव सहदेव के साथ पाणिग्रहण सम्पन्न करवाया। पंचम तथा कनिष्ठ पाण्डव सहदेव अश्विनी कुमारद्वय के मध्य किसी एकजन के अंश सम्भूत थे। सहदेव की देव-देह होने के कारण वे शौर्य-वीर्य में अति सुशोभन थे। (*सहायक ग्रंथ : हरिवंश*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

बं० १४२३ वर्ष के विदाई मुहूर्त्त और बं० १४२४ साल के आगमन के प्रारंभ में ही चिरविदाई देनी पड़ी हमसभी के परम आत्मीय शर्माजी (गुरुभ्राता श्रीवीरेन्द्र शर्मा) को। अखण्ड महापीठ की नींव देने के समय से ही शर्माजी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने प्रत्येक कर्म को अत्यंत दायित्वपूर्ण भाव से निभाया। श्रीश्रीमाँ के प्रति उनकी एकनिष्ठा निस्वार्थ थी। छोटे-बड़े प्रत्येक गुरुभाई-बहिन उन्हें शर्माजी कहकर ही पुकारते थे। आश्रम के प्रत्येक सदस्य के साथ उनके सम्पर्क मधुर और आन्तरिक थे। विनोदी स्वभाव के हमारे शर्माजी स्वत:स्फूर्तभाव से अनेक कार्य बड़ी कुशलता से कर देते थे। उनकी अमलिन हँसी और आन्तरिक व्यवहार की छाप हम सभी के हृदयों से कभी धूमिल नहीं होगी। लोकान्तर में उनकी शान्ति कामना हेतु समस्त गुरुभाई-बहिन एकात्मचित्त से प्रार्थना करते है श्रीगुरुमहाराज के श्रीचरणों में।

उन्मेष

(१९)

बुद्धपूर्णिमा – (दिनांक – ९/०५/०९)

क्रियायोग साधना के सम्बन्ध में श्रीश्रीमाँ के वचनामृत–

गतांक से आगे...

कुछ कुछ विशेष दिन हैं, मैं तुमलोगों की क्रियासाधना इस स्थूल चर्म-चक्षुओं से देखूँ या न देखूँ मेरा यह स्थूल शरीर ही तो सबकुछ नहीं है – तुमसब जो क्रियान्वित संतान हो, वे अपनी क्रिया साधना अखण्ड महापीठ के गर्भगृह में बैठकर करके जाना। यहाँ आकर जो नियमित क्रिया करते हैं, मानों, महीने में एकबार या जो प्रत्येक सप्ताह आकर करेंगे, वे अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं कि अखण्ड महापीठ – 'पीठ' नाम अकारण नहीं रखा गया, यहाँ पर चैतन्यशक्ति का खेल चलता है। मेरे स्थूलरूप में क्रिया नहीं देखने पर भी आसन पर जिनका तस्वीर प्रतिस्थापित है वे केवल चित्र नहीं बल्कि प्राणवंत है।

कईबार लोगों के रोग मुझे भोग करने पड़ते हैं, कईबार लोगोंके प्रारब्ध के कार्य करने पड़ते हैं – कभी तुम्हारे ही गुरुभाई-बहन, जिनकी किसीकारण मरणापन्न अवस्था होती है एवं जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके कर्मफल का बोझ मुझे उठाना पड़ता है। अकेले इतना बोझ उठाना क्या मेरे लिए सम्भव है? मेरा शरीर अभी पहले से दुर्बल हो गया है, इसीलिए गुरु-महाराज सर्वदा मेरे पास रहते हैं। यहाँ जो नियमित साधना करने आते है, गुरु-महाराज उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण देते है, इस बात का कभी अन्यथा होता नहीं, हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं। जो नियमित यहाँ आकर क्रिया नहीं करते,जागतिक आवरण के फलस्वरूप आलोक का विकास उनमें परिणामतः कम होता है। वे सिर्फ सद्गुरु ही नहीं, अन्तर के सद्गुरु से भी दूर रहते है। परिणामस्वरूप उन्हें जीवन में दुःख और मुसीबतें ज्यादा भोग करने पड़ते है। यदि तुम अन्तर में भगवान को जागृत कर लो, भगवान के सान्निध्य में ज्यादा रहो, भगवान की उपलब्धि कर सको तो तुम्हें दुःख झेलने नहीं पड़ेंगे एवं 'काल स्पर्श' नहीं करेगा। भगवान से दूर रहने के कारण ही काल स्पर्श करता है।

संसारी व्यक्ति कौन है? स्वयं शिव जो सृष्टिकर्ता हैं, वे सबसे बड़े संसारी हैं। तुमलोग अपने-आपको संसारी मानते हो! दो चार बच्चों के जन्म देने से ही संसारी नहीं हुआ जा सकता। इसके लिए कितने उलझनों का सामना करना पड़ता है, तुम्हारे सांसारिक जीवन में अशान्ति होती है। सृष्टि के कारणस्वरूप स्वयं विष्णु भी संसारी हैं । पर शिव के समान संसारी और कोई नहीं है। उनका संसार विराट् है। स्वयं श्रीकृष्ण भगवान भी संसारी है। श्रीकृष्ण की कितनी पत्नियाँ थीं और कितने सन्तान थे? शिवावस्था लाभ करने के लिए जो साधना भगवान ने दिखाई, वह साधना करने में भय का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार के काम-काज करते हुए उस साधना में कुछ समय तो सभी बिता सकते हैं। जो क्रिया नहीं करते, वे काल के स्रोत में अविरत आवागमन करेंगे – उसमें सुख-दुःख का भोग भी अवश्य ही रहेगा एवं दुःख का अंश ही ज्यादा रहेगा क्योंकि तमस् शक्ति का ज्यादा खेल इस पृथ्वी पर ही है, इसलिए घात-प्रतिघात से धक्का भी ज्यादा खाना पड़ेगा। सद्गुरु कितना भार वहन कर सकता है? उसकी देह भी तो नश्वर होती है। देह सीमा में आबद्ध है, उस देह से एक मनुष्य कितना भार वहन कर सकता है? इस अनित्य जगत् में सीमित भार का बोझ वहन करने की शक्ति उनकी भी तो सीमित होती है। यह तो असीम कर्मफल का बोझ है, शक्ति रहने पर भी, चिरकाल के लिए वहन नहीं किया जा सकता – समय आने पर उनके भी शरीर का अन्त हो जायेगा। असीम शक्ति को धारण करने के लिए उन्हें असीम की देह प्राप्त करनी होगी एवं असीम की देह प्राप्ति होने पर अधिक दिन नहीं रहती क्योंकि सद्गुरु तो नित्यमुक्त होते हैं। इस क्षुद्र-परिधि की सीमा में स्थूल-शरीर में कितने दिन कितना बोझ वहन किया जा सकता है? तुम्हारे श्रीश्रीबाबा का तो बोझ वहन करते-करते ही शरीर त्याग हो गया। गुरुमहाराजगण सर्वदा मुझसे कहते रहते हैं कि स्थूल-शरीर के निम्नांश में भोग धारण करना पड़ता है। 'हेड अफिस' में गड़बड़ होने से तो ज्यादा दिन नहीं रहा जा सकेगा। फिर भी अभी मेरे हृदय में समस्या आई है। पता नहीं कितने दिन रहूँगी; ज्यादा दिन भगवान यदि मुझे रखें तो यह तुमलोगों का ही सौभाग्य होगा। इसीलिए कहती हूँ, तुम्हारे निजस्व प्रारब्ध क्षय करने के लिए नित्य क्रिया कर तुमलोग सद्गुरु के सहायक बनो।

...क्रमशः

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला

श्री विष्णुपद सिद्धान्त ठाकुर

(३१)

गतांक से आगे–

श्रीरामकृष्णदेव – ''जानते हो नरेन, मन की कालिमा माँ काली की पूजा करने से दूर हो जाती है। अन्य देवताओं की पूजा करने पर भी, माँ काली ही आकर, मन का जंजाल साफ कर देती है; जिस देवता का जो कार्य है वह उस कार्य के लिए नियुक्त रहता है, किसी भी देवता की पूजा क्यों न की जाये अन्य देवता भी आकर सहायक बन जाते हैं। घर के मालिक मालकिन की खबर जैसे घर के किसी भी सदस्य को पूछने से मिल सकती है, देवी-देवताओं के क्षेत्र में भी यही है। किसी भी देवता या देवी मूर्ति की पूजा करने से या उनके नाम या मंत्र की पूजा करने से, वे ही अन्य देवी-देवताओं के पास ले जाऐंगे। किसी एक को अपने मन में स्थापित करने से अन्य के आसन भी अपने आप आ जायेंगे। आकाश के तरफ आइना दिखाने से क्या उसमें सिर्फ चाँद ही दिखेगा? उसके साथ क्या नक्षत्र-मंडल भी नहीं दिखता? इसलिए कहता हूँ मन में दुविधा मत रखो। जिसका मंत्र मन में आये, उसी का मंत्र जप करो, क्योंकि मन ही भगवान है।''

विवेकानन्द ने जिज्ञासु होकर कहा, ''यदि मन ही भगवान है तो दुविधा, संकोच या विचार भेद मन में क्यों आ जाता है?''

रामकृष्णदेव – ''वह तो अवश्यम्भावी है। माँ के पास जाने से अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त देवता, कोटि कोटि प्रकार की आशा, आनन्द, प्रेम, भक्ति, शक्ति एवं मुक्ति का द्वार खुल जाता है एवं जिनका जो प्रयोजन है उसी के अनुसार उस समय में योगायोग करना पड़ेगा, उसी के ही निर्देश लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। एवं उसी में से कोई एक नियुक्त होकर उसके मन में शामिल हो जाती है। सोचो कि तुम रथ के मेले में हाजिर हुए हो; वहाँ तो विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी है पर कोई पकौड़े खरीदता है तो कोई घी के पक्वान्न। जिसे जो सहन होगा, वह उस वस्तु को ही पसन्द करेगा; अन्य वस्तु भला क्यों लेगा?''

विवेकानन्द – ''बीच-बीच में मेरे मन में उथल-पुथल उठता है – क्यों मेरा मन आपके लिए व्याकुल होता रहता है? – यह आकर्षण क्या आपके द्वारा किया गया है या यह स्वयं ही हुआ हैं? दिन में एकबार दर्शन न होने पर मेरा मन व्याकुल हो जाता है और लगता है मानों वह दिन व्यर्थ हो गया है, ऐसा सिर्फ आपके लिए ही होता है। मेरे परिवार में इतना अभाव, दरिद्रता होने पर भी उस ओर मन में कोई कार्यकारी प्रभाव नहीं होता, परिवार के एक विशाल कर्तव्य का त्याग कर आपके पास बैठे रहना क्या पाप नहीं है? क्यों इस विराट् कर्म में बाधा आकर मैं एक अनिश्चित संसार से जुड़ता जा रहा हूँ? मन की यह एक विषम दुर्बलता है, क्या यह भी एक माया-मरीचिका या भ्रान्ति नहीं है? फिर आपको देखने से मन में यह होता है –

''टूटा घर तोड़ फेंको,
स्वर्ग सोपान बनाओ –
पाषाण का कारागार तोड़ो,
माँ! माँ! कहो, सब करो संकीर्तन'' –

गाने के सुर से विवेकानन्द के सारे अंग स्नात होकर चक्षुओं के जल से सर्वांग भीगने लगा और उनके दोनोंचक्षु मानों जैसे रक्तिम जवाफूल से वर्षा की धारा गिरने लगी दोनों गाल से, जैसे सुरधूनी वक्षस्थल पर अवतरण करते हुए पद युगल को धौत कर रही हो –

रामकृष्णदेव चक्षुओं से अश्रु बहाते हुए बोल उठे, ''माँ, तुमने यह क्या किया? नरेन को कहाँ ले जा रही हो? उसे नये वस्त्र धारण करवाकर मेरे पास लौटा दो माँ! मेरे पास लौटा दो।''

उसी समय अचानक आरती का घण्टा बज उठा एवं अंजान कोई भक्ति गद्‌गद् कंठ से गा उठा –

''जय-जय राम! जय-जय कृष्ण
रा-म कृष्ण, करो सार
जय-जय सीता! जय-जय राधा!
रामकृष्ण प्रभो, तुम हो पारावार।''

...क्रमशः

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीश्री सर्वाणीमाँ को विशेष अनुरोध – वे यदि ड: गोपीनाथ कविराजजी के १८ पत्रके साधन मार्ग के निगूढ़ तत्त्व एवं साधन प्रणाली के ऊपर आलोकपात एवं व्याख्या हिरण्यगर्भ पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित करे तो यह एक अमूल्य सम्पद हो जाएगी। परवर्तीकाल में इसे एक पुस्तक का रूप दिया जा सकता है।

–विजन कुमार सेनगुप्त

ड: गोपीनाथ कविराजजी के पत्रावली प्रसंग पर :–

मर्मी साधक ड: गोपीनाथ कविराजजी के गुरुभ्राता श्रीअक्षय कुमार दत्तगुप्त महाशय को ज्ञानगंज के साधनमार्ग के क्रियायोग के जो समस्त निगूढ़ तत्त्व, तथ्य एवं साधन प्रणाली के विषय पत्रों में उल्लेख किये गये हैं उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न :–

६। पत्र (७) - (द्वितीय भाग) '१०८ योग क्रिया स्वतत्र है - वह पुरुषोत्तम भाव का निर्देशक है। उसका पूर्ण स्वतंत्र रूप चित्त साम्राज्य में प्रतिष्ठास्वरूप' – (इसकी व्याख्या)

उत्तर - (द्वितीय भाग) – १०८ में पुरुषोत्तम भाव की साधना। यह परमशिव की नारायण तत्त्व में उपनीत होने की साधना है। यह साधना परमयोग की साधना है, महाकारण भूमि की चेतना की साधना; इस योग में उन्नीत होने पर योगीश्वर के समीप दिव्यलोक उद्भासित होता है एवं योगीसत्ता में दिव्यभूमि के दिव्यज्ञान का स्फुरण होता है। योगी को उस समय दिव्यचक्षु की उपलब्धि होती है। हिरण्यगर्भ से इस पुरुषोत्तम भाव की साधना आरम्भ होती है। गीता में लिखित है परमब्रह्म का निर्गुण स्वरूप ही अक्षर पुरुष या अक्षर भाव और पुरुषोत्तम भाव में वे निर्गुन होने पर भी सगुण, सृष्टि-स्थिति-प्रलय कर्ता, यज्ञ तपस्या के भोक्ता एवं सर्वभूतों के ''गतिर्भता प्रभु: साक्षी निवास: शरणं सुहृत्''– यही है उनका श्रेष्ठ समग्र स्वरूप। अतएव इस विषय में पुरुषोत्तम की स्वतंत्रता प्रकाशित होती है। श्रीकृष्ण भगवान कहते है, ''अक्षर से भी मैं उत्तम हूँ।'' अर्थात्, प्रकृति (महागुण या चित्शक्ति महामाया) से परमेश्वर (चिद्) उत्तम। गोपीनाथजी ने कहा है, ''बोध से भाव पर्यन्त योगमाया का प्रभाव उसके बाद गुण से महाभाव पर्यन्त शुद्ध माया का खेल। शुद्ध माया अतिक्रम होने के साथ ही महाज्ञान का उदय होता है। परिणामस्वरूप 'चरण' का ही दर्शन होता है। 'चरण' प्राप्ति ही वस्तुत: महामाया रूप में स्वरूप स्थिति (अर्थात्, चित्-प्रकृति का ज्ञान पूर्ण रूपेण निजबोध में स्फुरित होता है) – यही हैं १०७। इसके पश्चात् 'चिद्' – जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुन: विशुद्ध गुरु भी (अर्थात् जो समस्त उपाधि वर्जित गुरु) कहा जाता है। यही संख्या पूर्ण होती है।

गीता में क्षर एवं अक्षर पुरुष की व्याख्या है। आचार्य शंकर के मत में, ''कार्योपाधियुक्त जो भौतिक एवं विनश्वर पदार्थ हैं वही क्षर है एवं कारणोंपाधियुक्त अविनश्वर मायाशक्ति ही 'अक्षर पुरुष'।'' श्रीश्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने कहा है - ''पुरुष दो प्रकार के हैं। जिनकी आसक्ति समन्वित विषय आदि में दृष्टि रहती है वे देह संबंधी बद्धजीव, उनका चैतन्य मात्र भूतात्मा में पर्यवसित है; ये ही जन्म-मृत्यु चक्र पर आरूढ़ होकर तेजी से घुमते रहते हैं। और जिनकी दृष्टि कूटस्थ में निबद्ध हैं उनका मन देह बोध से उत्थित होकर प्रत्यगात्मा में निबद्ध रहता है, उनका (जीव का) मन प्रत्यगात्मा के साथ मिलित होकर परावस्था में परमात्मा से मिल जायेगा – अत: वे अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं, इसीलिए वे स्वयं अक्षर स्वरूप हो गये हैं। और उनके शरीर में आत्मबोध नहीं है। उनसबों को त्रिकूटी में परमस्थिति प्राप्त हो गयी है। उन्होंने अभय एवं अमृतपद प्राप्त किया है।'' गीता में श्रीभगवान ने कहा है परमात्मा ही है पुरुषोत्तम या परमेश्वर। ''उत्तम पुरुषस्त्वन्य: परमात्मे त्युदाहृत:। यो लोक त्रयमाविश्य विभर्त्यध्यय ईश्वर:।।'' –(गीता अ:-१५, श्लोक १७)। ये क्षर एवं अक्षर से भी विलक्षण अन्य एक पुरुष ही उत्तम पुरुष हैं। उस उत्तम पुरुष का लक्षण है कि वे परमात्मा के रूप में श्रुति में कथित है अर्थात् वे परम, ऐसी आत्मा। वे आत्मा है इसलिए अचेतन क्षर से विलक्षण और परमत्व हेतु भोक्ता अक्षर पुरुष से भी विलक्षण, यही इसका तात्पर्य है। उनका परमात्मत्व ही यह दर्शात है कि वही ईशनशील ईश्वर अव्यय एवं निर्विकार होने पर भी लोकत्रय के हृदय में आविष्ट होकर प्रत्येक प्राणी का पालन करते हैं। योगी कूटस्थ के मध्य विचरण करते करते कूटस्थ का अवलोकन करते करते बाद में एक उत्तम पुरुष का दर्शन करते हैं। शास्त्र में जिसे परमात्मा कहते हैं। हिरण्यगर्भ स्थित कूटस्थ ही सर्वप्रथम दर्शन होता है। उसी से समस्त भूत उत्पन्न हुए है, वे ही सबों के सृष्टिकर्ता हैं।

इस हिरण्यगर्भ कूटस्थ के मध्य ही पुरुषोत्तम का निवास है। कूटस्थ का दर्शन करते करते योगी उसमें ही उत्तम पुरुष का अवलोकन करते हैं। यही है पुरुषोत्तम रूप। इस अवस्था में योगी के उपनीत होने पर तब समष्टिगत भाव में प्राणतत्त्व को अधिगत करने में समर्थ होते है। इस उत्तमपुरुष या पुरुषोत्तम के दर्शन से योगी की बोध चेतना में परुषोत्तम भाव का उदय होता है। पुरुषोत्तम के मध्य जड़ लक्षण लक्षित नहीं होता यह शुद्ध चैतन्य ज्योतिः मात्र होने पर भी कर्ता एवं ईशानभाव समन्वित, जो सबों के हृदयस्थ होने पर भी, हृदयभाव द्वारा अनावृत, ये नराकृति नारायण पुरुषोत्तम या भगवान। ये पुरुषोत्तम है 'आत्मनारायण परम'। परम आत्मनारायण का ज्ञान होते ही पुरुषोत्तम भाव के व्याप्ति की सूचना मिलती है। इस अवस्था को परम शिवावस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था प्राप्त होते ही योगी की चेतना परपरावस्था में उपनीत होकर विराट् के समष्टि बोध में चिरन्तन शाश्वत नित्य में उपनीत होती है। हिरण्यगर्भ स्थित पुरुषोत्तम के साथ विराट् का संयोग रहता है इसीलिए यह अवस्था भी नित्य है। अतएव पुरुषोत्तम चेतना नित्य होने हेतु नित्य की नित्य गतिलाभ होना संभव होता है, फलस्वरूप योगीश्वरगण महाकारण एवं कारणभूमि में अनायास यातायात करने में सक्षम होते है। इस अवस्था की प्राप्ति के पश्चात् योगी की पूर्ण स्वातंत्र्य रूप चिद्-साम्राज्य में प्रतिष्ठा होती है।

पुरुषोत्तम भाव के प्रसार से यह जाना जा सकता है कि पुरुषोत्तम क्षरातीत एवं अक्षर से उत्तम, परिवर्तनशील वस्तु से भी ऊपर है। प्रभु जगद्बन्धुसुंदर के भाषा में – ''मायिक सृष्टि के साथ कृष्ण का लेशमात्र संपर्क नहीं। वे एकलेश्वर, स्वतंत्र ईश्वर, यह स्वतंत्र ईश्यर ही पुरुषोत्तम नित्य कृष्ण।''

(आत्मज्ञान के प्रसार में पुरुषोत्तम अवस्था का वर्णन– गीता की व्याख्या के पूर्व ही उद्धृत है कि जीव परमात्मा के साथ एक होकर भी जैसा उनसे प्राणप्रवाह के मध्य से जाग्रतावस्था या स्थूल शरीर में अवतीर्ण हुआ है, ठीक विपरीत दिशा में इसे पुनः स्वस्थान में निज केन्द्र में प्रत्यावृत्त होना होगा। यह प्रत्यावृत्त होने के पथानुसरण को ही साधना कहते है। प्रधानतः जाग्रत भूमिका – स्थूल देह, फिर स्वप्न भूमिका या सुक्ष्म देह, फिर सुषुप्ति या कारणदेह को अतिक्रम कर योगी को चतुर्थ भूमि या तुरीय भूमि में पहुँचना होगा। छान्दग्योपनिषद् में वर्णित है आत्मज्ञान से प्राण स्थिर होता है, उस स्थिर प्राण से ही योगीगण तुरीय पद पर उपनीत हो सकते है। त्रिलोक में जो कुछ भी स्थित है वह समस्त ही प्राण के वशीभूत है। आत्मा या परमेश्वर से यह प्राण जन्मग्रहण करता है। पुरुष देह में जैसी छाया उत्पन्न होती है, वैसे ही यह प्राण भी आत्मा के अनुगत रहता है एवं मनःसंपादित कोशादि द्वारा इस स्थूल शरीर में उसका आगमन होता है। प्रत्यगात्मा चिन्मात्र – वे कूटस्थ, जीवात्मा इसका ही किरणमात्र। ये चित्कण प्रत्यगात्मा है शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव। ये चित्कण कितने हैं, इनकी संख्या अगणित है। ये सारे चित्कण ही एकोहं बहुस्याम – इसका बहु। किन्तु बहु होने के बावजूद भी वह एक अद्वितीय के साथ सर्वदा योगयुक्त। यह चिन्मात्र पुरुष ही अनन्त चिदाकाश के वक्ष पर प्रतिक्षण स्फुटित हो रहा है। इस चिदाकाश ही अव्यक्त परब्रह्म के व्यक्त भाव। मानों शिव के संग शिवानी संयुक्त। उस अव्यक्त भाव को समझने में जो सक्षम हैं वे पुरुष श्रेष्ठ उत्तमपुरुष। उस ब्रह्म संयुक्त आद्याशक्ति से जो नाद (महत्) उत्पन्न होता है उस नाद से ही बिन्दु (अहंकार तत्त्व) की उत्पत्ति होती है। बिन्दु शिवात्मक, बीज शक्तात्मक एवं नाद शिव-शक्तात्मक। इस बिन्दु-बीज एवं नाद से त्रिशक्ति – ज्ञान, इच्छा एवं क्रियाशक्ति अर्थात् रुद्र, ब्रह्मा एवं विष्णु की उत्पत्ति हुई है। यह चेतनभोक्ता पुरुष ही चित्कण। ये हैं अंगुष्ठमात्र पुरुष, ये हैं धूमहीन ज्योति समान, ये हैं अन्तरात्मा। ये समस्त जीव देहों के साथ संश्लिष्ट हैं। मुंजातृण से जैसे ईषिका (काशतृण) पृथक किया जाता है, उसी प्रकार उस पुरुष को स्वीय शरीर से पृथक कर देखा जा सकता है। बाद में वह चिदंश भी एक अद्वितीय ब्रह्म के मध्य मानों विलीन हो जाता है क्योंकि असंख्य घटों में एक ही सूर्य के असंख्य प्रतिबिम्ब पड़ते हैं। असंख्य घटोपाधि के विनाश के साथ उन समस्त चिदाभासगणों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तब केवल एक ही वर्तमान रहता है; एक बोलनेवाला भी कोई नहीं रहता – ''सदैव सोम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्'' – (छान्दोग्योपनिषद)। यही माया का या चित्कणों का आत्म-विलोपन। जो खेल आरम्भ हुआ था, वह खेल समाप्त हो गया। यही है कैवल्यावस्था। यही कर्म की निवृत्ति होती है। कैवल्यावस्था में उपनीत योगीश्वरगण जीवन्मुक्त होते हैं। कैवल्यपद प्राप्त कर योगी वृहत् कूटस्थ मध्य 'हिरण्यगर्भ' कूटस्थ का रूप दर्शन करते हैं। यही से आरम्भ हुई पुरुषोत्तम-भाव की साधना। इस हिरण्यगर्भ कूटस्थ में सर्वप्रथम सर्वभूतमय शिवज्ञान का ज्ञान होता है। तत्पश्चात् ईशनशील सर्वज्ञ नारायण का दर्शन होता है। वही है पुरुषोत्तम-रूप। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम कूटस्थ मध्य

ही चिदाकाश में प्रतिबिंबित होते है। कूटस्थ में ही साधना की परिपक्वावस्था में उन्हें योगी साधकगण दर्शन करते है। ये हेमाण्ड–कूटस्थ ज्योति स्वरूप, पुनः कभी तेज का शान्तरूप में अत्यंत गाढ़ा नीलवर्ण। उसी अंड में ही वे पुरुषोत्तम नारायण विराजमान है। इस चिज्योति कूटस्थ मंडल में या हिरण्यगर्भ में पुरुषोत्तम को जो सद्गुरु कृपा से दर्शन करते है, वे धन्य हैं।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

भ्रमण

श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा

(५)

श्रीश्रीबद्रीविशालजी के दर्शनों एवं उनके श्रीचरणों में आस्था व्यक्त करने का दिन निश्चित हुआ १९ सितम्बर, बुधवार, वर्ष २०१२। अतिवृष्टि का प्रकोप एवं उसके साथ–साथ पहाड़ी अंचल की विषम स्थितियाँ रहने पर भी श्रीश्रीमाँ की अपार कृपा से उस दिन सुबह से ही आकाश एकदम साफ था। वाहन–चालक ने हम सभी के साथ लाए समान को सुव्यवस्थित ढंग से गाड़ी में रखा तथा श्रीश्रीमाँ के आदेशानुसार हमलोगों ने स्वर्गराज्य हिमालय पथ की ओर शुभ तीर्थयात्रा शुरु की। स्वर्गद्वार हरिद्वार से रवाना होकर ऋषिकेशधाम को स्पर्श करते हुए हमलोग अग्रसर हुए 'पंचप्रयाग' के पथ की ओर। 'प्रयाग' शब्द का अर्थ है एकाधिक स्वर्गीय नदियों का संगमस्थल, जो कि हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थस्थल भी है। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि इस पथ का प्रथम पड़ाव है देवप्रयाग, तत्पश्चात् रुद्रप्रयाग और फिर कर्णप्रयाग, इसके पश्चात् नन्दप्रयाग और अन्त में विष्णुप्रयाग। इस तीर्थपथ पर और भी अनेक महत्वपूर्ण स्थान है जैसे जोशीमठ, चामौली, श्रीनगर, पाण्डुकेश्वर, हनुमानचोटी इत्यादी। ये सभी स्थल तो देखेंगे एवं इसके साथ ही जीवन में पहली बार हिमाद्रिपति का समीप से दर्शन करते हुए पहुचेंगे १०,३५० फीट की ऊँचाई पर अवस्थित व्यासतीर्थ श्रीश्रीबद्रीनाथधाम में, अनेक दिनों से प्रतीक्षारत मन के किसी कोने में छिपा हुआ आनन्द बाहर के विभिन्न प्राकृतिक सौन्दर्यों का अवलोकन करते हुए सभी के चेहरों से झाँकने लगा। गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहा था कि अभी अभी तो प्रारम्भ हुई है स्वर्गारोहण की पथ यात्रा, वहाँ के सुन्दर प्राकृतिक मनोरम दृश्यों को देखकर नयन मानों शीतल हो रहे हैं वहीं मन मतवाला होकर भँवरे की तरह अनुपम प्राकृतिक दृश्यों का रसपान कर रहा था। ना तो मन में कोई भय था और ना ही चिन्ता की कोई रेखा, निश्चिन्त मन नगाधिराज की परिक्रमा करते–करते आगे बढ़ रहा था; नीलकण्ठ पर्वत से सटे हुए नर–नारायण पर्वत के चरणोंतले पहुँचने के उद्देश्य से। जहाँ तीर्थयात्रा में पथ की संगिनी माँ दुर्गा हो, फिर वहाँ कोई भी बड़ी विपत्ति दस्तक देने से पहले सोचती हैं, यह तो सम्पूर्ण जगत् जानता है। प्राकृतिक आपदा का प्रबल वेग भी परमा–प्रकृति के सम्मुख मस्तक नत करने के लिए मजबूर हो जाता है। जगत् में मनुष्यों के मध्य जब विभिन्न प्रकार के अपकर्म प्रवेश कर जाते हैं तो यह भूखण्ड पाप से जर्जरित हो उठता है, परमपुरुष और परमाप्रकृति के अखण्ड सद्इच्छा से एवं नवजागरण के उत्स संधान के उद्देश्य से, प्रकृति के द्वारा ही खण्ड–प्रलय या महाप्रलय होता है। हमलोग परमाप्रकृति भगवती के संकल्प साधन की परिकल्पना सफल करने के उद्देश्य को लेकर उनके ही साथ श्रीश्रीबद्रीनाथधाम की ओर अग्रसर हो रहे थे। हमारी गाड़ी द्वारा ऋषिकेश से ७० कि.मी. की ऊँचाई पर हिमालय में आते ही पहले था प्रयागक्षेत्र या 'देवप्रयाग'। वहाँ मिलती है स्वर्ग–गंगा की दो धाराएं, एक का नाम भागीरथी और दूसरी का नाम अलकानन्दा। ऐसा कहा जाता है कि, यह स्वर्ग–गंगा अलकानन्दा श्रीश्रीबद्रीनाथ के चरणों को स्पर्श व धौत करती हुई जब आगे बढ़ती है तो वहाँ एक अन्य धारा उस में मिलित होती है। यह मिलित धारा ही देवप्रयाग से 'गंगा' नाम से मर्त्य में अवतरण करती है, जिसका परवर्ती संगमस्थल इलाहाबाद का प्रयाग और अन्त में पश्चिमबंगाल का गंगासागर। देवप्रयाग ऐश्वर्य से परिपूर्ण प्रकृति की गोद में देवताओं की यज्ञभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। कथित है, पंचप्रयाग के मध्य देवप्रयाग ही सर्वश्रेष्ठ है। पौराणिक युग में सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी ने वहाँ एक यज्ञ किया था। वहाँ गंगा के तीर पर है एक यज्ञवेदी और उसके पास में है छोटा जलाशय जो कि 'होलकुण्ड' नाम से विख्यात है। यह तीर्थयात्रियों के लिए एक दर्शनीय स्थल है, इसके अतिरिक्त आचार्य शंकर भी तीर्थ परिक्रमा करते हुए इस संगमस्थल

देवप्रयाग में गये थे। तीर्थयात्रा पूर्ण करने के पश्चात् उन्होंने परम तृप्ति का अनुभव किया देवप्रयाग में। चलती हुई गाड़ी से जहाँ तक हमारी निगाहें पहुँचती हैं वहाँ पहाड़ के ऊपर है एक छोटा शहर। दियासलाई के डिब्बे के सदृश छोटे-छोटे घर और उनमें से झलकता प्रकाश अद्‌भूत लग रहा था। पहाड़ पर चलने के लिए निर्मित पथ पर वैद्युतिक आलोक की समुचित व्यवस्था भी दृष्टिगोचर हो रही थी एवं वहाँ संगमस्थल के समीप पहाड़ और दोनों नदियों के संगम की शोभा अपूर्व नयनाभिराम।

हमारी गाड़ी पहाड़ पर तीव्र गति से ऊर्द्ध में पाकदण्डी को पारकर द्वितीयतम प्रयागक्षेत्र 'रुद्रप्रयाग' की ओर जा रही थी। इस पथ पर कुछ धार्मिक स्थान भी है जैसे रानीबाग और उसके पश्चात् श्रीनगर। पुराण या ऐतिहासिक कहानियों में वर्णित है कि रानीबाग से श्रीनगर जाने के पथ की ओर एक ग्राम है, जहाँ है जनक राजा का एक प्राचीन आश्रम। उन्होंने वहाँ दीर्घदिनों तक तपस्या की थी, जिसके प्रमाण स्वरूप तपोस्थली में कुछ निदर्शन आज भी है। अलकानन्दा के किनारे-किनारे समग्र पहाड़ी क्षेत्र का सौन्दर्य नयनों को आकर्षक करने वाला एवं तृप्त करने वाला था तथा नदी की इठलाती लहरों की चंचलता बरबस ही हमलोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग प्राय: ७० कि.मी. दूर था अर्थात् ऋषिकेश से दूरी प्राय: १४० कि.मी. हुई। वहाँ पर हमने कुछ देर रूककर चाय नाश्ता लिया। कुछ समय उपरांत हमलोग विश्राम लेकर पुन: यात्रा प्रारम्भ कर रुद्रप्रयाग की ओर अग्रसर हुए। जैसे-जैसे हमलोग आगे बढ़ रहे थे मार्ग में अनेक असमानताएं आ रही थी कहीं बहुत चढ़ाई तो फिर कहीं समतल, फिर अल्प उतराई होकर पुन: चढ़ाई इसीलिए गाड़ी हिलते-डुलते हुए हिचकोले खाती आगे बढ़ रही थी। हमलोगों में भी उत्साह और आनन्द हिलोरें ले रहा था। कवि की भाषा में, 'जिधर आँखें घूमाता हूँ, श्यामल मूरति देखता हूँ;' प्रकृति हमें जैसे आनन्द के सागर में प्लावित कर रही थी। जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे तीन तरफ पर्वत मालाएं जो पहाड़ी वृक्षों द्वारा आवृत थी तथा उनके बीच से जा रहा था मार्ग। उसी मार्ग के निकट गभीर नीचे से अलकानन्दा प्रवाहित हो रही थी, उसके उत्तर में ही है प्राचीन संगम। वहाँ स्वर्गगंगा अलकानंदा के साथ संयुक्त हुई है और एक स्वर्गगंगा जो गंगोत्री हिमनद द्वारा सृष्ट हुई है, केदारनाथ पर्वत से उतर कर, दूसरी ओर से आयी चोराबारि हिमखण्ड द्वारा सृष्ट कालीगंगा, चोराबारि ताल के साथ युक्त होकर वहाँ से मर्त्य में अवतरण करती है 'मन्दाकिनी' नाम से। स्वर्ग से आशीर्वाद पूत इन दोनों गंगा नदियों अलकानन्दा और मन्दाकिनी के संगमस्थल को ही 'रुद्रप्रयाग' कहा जाता है। हिमालय में ही शिवालय है ये हम सभी जानते है। मैं अपने साथियों द्वारा यह जान पाया कि पंचप्रयागों में प्रथमतम प्रयाग देवप्रयाग में है श्रीरामचन्द्र की स्मृति में 'बाबा कमलेश्वर' शिव का प्राचीन मन्दिर और द्वितीयतम प्रयाग रुद्रप्रयाग है 'बाबा रुद्रनाथ' या 'रुद्रेश्वर' शिव मन्दिर। इसके अतिरिक्त यही से शिवक्षेत्र केदारनाथजी के मन्दिर में जाने का पथ शुरु होता है, मन्दाकिनी के तट से पहाड़ी पथ पकड़कर ऊपर की ओर जा रहे थे। रुद्रप्रयाग अंचल में ही प्रसिद्ध व्याघ्र शिकारी जिम कॉरबेट की स्मृति में निर्मित स्थान है।

हमलोग रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हुए तृतीयतम प्रयागक्षेत्र 'कर्णप्रयाग' की ओर पहुँच रहे थे। इस पृथ्वी पर असंख्य पर्वतमालाओं के होते हुए भी सुशृंखल और सौन्दर्यबहुल तपोभूमियों में हिमालय ही सर्वश्रेष्ठ है। जिसके फलस्वरूप युग-युगान्तर से ब्रह्मर्षि से आरम्भ करके महामुनि, महातपा, महावतार उपाधिधारी अति शक्तिशाली तेज सम्पन्न महात्माओं की आवास-भूमि और तपोस्थली यह हिमालय ही रहा है। प्राचीन मठ, मन्दिर और सरोवर के अतिरिक्त वहाँ है अनन्त आध्यात्मिक ऐश्वर्य का खजाना जिसे आहरण करने हेतु साधु-सन्यासी सदा सर्वदा हिमालयोन्मुखी रहते है। हमलोग आगे की ओर बढ़ रहे थे समस्त ऐश्वर्य की अधिकारिणी जगत्माता भगवती के चिरआश्रित संगी होकर बद्रीनाथधाम में। वहाँ स्वर्गगंगा अलकानन्दा के साथ युक्त हुई है पेन्डार नदी जो कर्णगंगा के नाम से भी अभिहित होती है। संगम में यही नदी हिमालय के नन्दादेवी पर्वत से सट कर प्रवाहित होते हुए आती है, पेन्डार की हिमनद से सृष्टि हुई है कर्णप्रयाग का संगमस्थल भी एक अपूर्व दर्शनीय स्थान है। सभी तीर्थयात्रियों के लिए यह मनोमुग्धकारी पहाड़ी क्षेत्र एवं नदियाँ का मिलन तीर्थ बहुत आकर्षक है। वहाँ पहाड़ के ऊपर जंगल के समीप कुछ बस्तियाँ बसी हुई है, मन्दिर का शिखर भी दिखाई दिया; यह रुद्रप्रयाग से १९ कि.मी. की दूरी पर था। लेकिन ऋषिकेश से इसकी दूरी प्राय: १६९ कि.मी. है। हमलोग पहाड़ों को अतिक्रम करते हुए वहाँ के अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य का उपभोग करते करते

आगे बढ़ रहे थे। द्वापर युग की महाभारत की कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुन्ती पुत्र महावीर और दाता कर्ण ने इस प्रयाग क्षेत्र में आकर एकबार अपने आत्मकर्म के उद्देश्य से अनेक दिनों तक तपस्या की थी। अपने परमपिता सूर्यदेव के आशीर्वाद से 'कवच-कुण्डल' प्राप्त किए थे वे कर्ण के अभेद्य वर्म और कर्णभूषण थे। ऐसा कहा जाता है कि माता कुन्ती ने अपने इस पुत्र को जन्म देने के पश्चात् ही स्मृति चिह्न रखने के लिए कर्णछेद कर स्वर्णकुण्डल पहना दिए थे। वहीं से उनका नाम पड़ा कर्ण। महावीर कर्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन का साथ देकर अर्जुन के विरुद्ध युद्ध कर प्राण गवाएँ। उन्हीं के नाम से प्रयाग का नाम हुआ 'कर्णप्रयाग'। एकबार स्वामी विवेकानन्द ने उस प्रयागतीर्थ में निरंतर १८ दिनों तक तपस्या की थी। वहाँ एक ऐसा मन्दिर है जहाँ हिमालय कन्या उमादेवी और महावीर कर्ण का विग्रह है, जो आज भी नित्य पूजित होता है।

इस सम्पूर्ण तीर्थयात्रा में हमने प्रकृति के जिस अपरूप माधुर्य और अपार्थिव आनन्द की उपलब्धि की उसे पाठकों को शब्दों से समझाना बहुत ही मुशकिल होगा। सत्य ही वह एक महाआनन्द की उपलब्धि थी। कर्ण प्रयाग से पथ की दूरी २१ कि.मी. थी। देखते ही देखते हमलोग अपने निर्दिष्ट लक्ष्य 'नन्दप्रयाग' पहुँच गए।

...क्रमश:

–मातृचरणाश्रित स्वामी संवेदानंदजी

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

आश्रम समाचार

१५ अप्रैल –बंगाब्द १४२४ की सूचना के शुभसंध्या पर श्रीश्रीमाँ के दर्शन के अभिलाषी अनेक भक्तों का समागम हुआ। सायंकाल में सत्संग में श्रीश्रीमाँ ने क्रियायोग सम्बन्धीय अत्यंत गूढ़ साधना के अमूल्य रहस्य पर प्रकाश डाला।

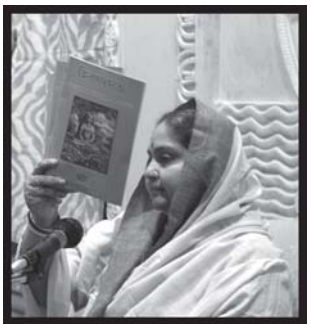

१६ अप्रैल – इसदिन सायंकाल में श्रीश्रीमाँ की उपस्थिति पर आश्रम में संगीत परिवेशन किया प्रसिद्ध शिल्पी श्रीअरिन्दम गांगुली ने।

२८ अप्रैल – अक्षय तृतीया की पुण्यतिथि पर श्रीअन्नपूर्णा क्षेत्र में श्रीश्रीगजानन की पूजा के माध्यम से उनके विग्रह की प्रतिष्ठा दिवस मनाया गया।

१० मई –बुद्ध पूर्णिमा की पुण्य तिथि पर श्रीश्रीबाबाजी महाराज के श्रीविग्रह प्रतिष्ठा दिवस मनाया गया। संध्या में आश्रम में श्रीश्रीमाँ ने क्रियायोग साधन सम्बन्धी अत्यंत शिक्षणीय कुछ वक्तव्य पेश किए। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी का परिचालन गुरुभ्राता डा: वरुण दत्त ने किया।

१- २० जून– इस अवधि में सिद्ध सन्त श्रीश्रीटाटबाबा की उपस्थिति ने आश्रमवासियों को उनकी सेवा का सुअवसर प्रदान किया।

९ जून –श्रीश्रीजगन्नाथ देव की स्नानयात्रा के दिन श्रीश्रीमाँ की आविर्भाव तिथि मनायी गई। श्रीश्रीअन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र में अनुष्ठित हुई श्रीश्रीगुरुपूजा एवं नारायण पूजा। दोपहर में भक्तवृन्दों ने प्रसाद ग्रहण किया। संध्या में आश्रम मन्दिर में भजनों का मनोहर अनुष्ठान प्रस्तुत किया गुरुभ्राता और भगिनियों ने। अनुष्ठान के अन्तिम पर्व में श्रीश्रीमाँ के स्वकन्ठ से गीत कुछ सुमधुर भजन और स्तवों ने उपस्थित भक्तमंडली को विमोहित किया।

२५ जून – इस संध्या में आध्यात्मिक सभा के २३वें पर्व पर 'कठोपनिषद् प्रसंग' पर अपना तात्त्विक वक्तव्य प्रस्तुत किया डा: वरुण दत्त ने।

आगामी अनुष्ठान सुची

जन्माष्टमी – १५ अगस्त, मंगलवार

अध्यात्मिक सभा – १७ सितम्बर, रविवार, संध्या ७ बजे

महालया – २० सितम्बर, बुधवार

दुर्गा नवरात्रि – २१ - ३० सितम्बर

२५ सितम्बर (पंचमी):– संध्यानुष्ठान

२७ सितम्बर (सप्तमी):– संध्यानुष्ठान

२८ सितम्बर (अष्टमी):– श्रीश्री श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा के तिरोभाव दिवस उपलक्ष्य पर दोपहर में भण्डारा।

२९ सितम्बर (नवमी):– दोपहर में श्रीश्रीदुर्गादेवी का महाप्रसाद भण्डारा

कोजागरी पूर्णिमा (लक्ष्मीपूजा):– ५ अक्टूबर, बृहस्पतिवार

Sri Sri Ganesha

Sree Sree Maa Sharbani

Unable to bear the humiliation of her husband (Lord Shiva) meted out by her father (Prajapati Daksha), Devi Sati gave up her mortal coil and took rebirth as Devi Parvati, daughter of Himalaya and Menaka and regained Lord Shiva as her husband through great tapasya. Being childless for years, she undertook a vow of penance to propitiate Lord Hari Narayana. After one year, Bhagwan Sri Krishna, pleased with her, appeared in his divine form amidst sages and savants and announced his blessing boon – a son for Devi Parvati. Immediately a ball of divine light emanated from Lord Sri Krishna and entered the womb of Parvati Devi. Subsequently a son was born, spreading illuminating radiance with his presence. This son of Mata Parvati is popularly known as Ganesha. In reality, Lord Krishna himself appeared in the form of Lord Ganesha's benevolent form. Ganesha is ayonisambhava, a uniquely created being in this universe. It is said that after his birth, the devas arrived from all the worlds to greet him. With them, Lord Shani also came. Lord Shani's wife had cursed him saying that whosoever he lays his eyes on shall face destruction. Remembering this, Lord Shani did not directly look at Ganesha. When Devi Parvati questioned him on such behaviour, Lord Shani explained the situation with the story of his curse. In spite of this, Devi Parvati requested Lord Shani to have a glance. As soon as he did, Ganesha's head fell off from the body. When the news of this unfortunate incident reached the ears of Shri Vishnu, he immediately arrived at the scene. On the way, he came across a sleeping white elephant, cut its head and on reaching Shiva's abode, placed it on Ganesha's decapitated neck, reviving him. In order to ensure that he is not disrespected for this appearance, the gods enacted a rule that Lord Ganesha is to be worshipped before any other and without him being serviced first, no puja will be accepted. Thus every auspicious event begins with invocation, prayer or worship of Lord Ganesha.

The Puranas provide a rich source of information on Lord Ganesha and events involving him. The story about his tusk being broken is related to his interaction with Bhagwan Parashurama. Lord Parashurama, after destroying the Kshatriya race twenty-one times, came to Kailasha to meet Lord Shiva and thank him for giving him the power to achieve his task. Shiva and Parvati were in their room sleeping and Ganesha was guarding the door. On being prevented from entering by Ganesha, an enraged Parashurama attacked Ganesha and a ferocious battle ensued. During this battle, Ganesha could not be defeated. Finally Parashurama threw his battle axe towards Ganesha. Knowing that the axe was gifted by Lord Shiva, Ganesha did not want it to fail. The axe struck Ganesha on one of his tusks, which broke. From this incident, Ganesha is also known as 'Ekadanta' or one-toothed. Another tale of the Skanda Purana mentions about a demon called Sindur, who entered Parvati's womb in the eight month of conception and cut off the

baby's head. Being divine, the baby did not die and was born without a head. Devarshi Narada, seeing the headless new born child, asked for an explanation. He was informed of the incident that occurred within the womb. Narada then asked the child to find his own head. The child, using his divine power, cut off the head of Gajasura and put the elephant asura's head on himself. Hence, his name 'Gajanan', that is, one with the head of Gaja. There is another interesting story behind Ganesha's birth – of him having being crafted by Parvati by rubbing her own divine skin and using the light-material from it to make an idol's body. To please her, Shiva put an elephant's head on the body. Immediately it sprung to life, circumambulated Mata Parvati, sang her glories and demonstrated his deep wisdom and devotion. Through the blessings of Lord Shiva and Devi Parvati, he is considered the head of the Ganas, remover of obstacles (Vighna-Vinashak) and bestower of attainment (Siddhidata) in any virtuous effort. Ganesha always remains engaged in spiritual practice. Through the curse of tulsi, he was married to Pushti.

Lord Ganesha is usually depicted with a large body, three-eyes, four hands (holding conch shell, chakra, mace and lotus) and an elephant's head. The mouse is his carrier. He is the son of Adya-Shakti and an avatar of Lord Narayana. This is his eternal form. He remains one of extraordinary power, giver of boons and an epitome of benevolence, who presence is considered most auspicious. By her tapasya, Devi Parvati had obtained the Lord of the Universe, Sri Krishna, as her son in the form of Sri Ganesha. He is a unique creation.

The tantras provide several forms of Ganesha based on fundamental principles of creation. They include Bal-Ganesha, Siddhi-Vinayak, Maha-Ganesha and Sri Ganesha. Of them, Maha-Ganesha is the manifestation of Durga-Shakti as Ganesha. Maha-Ganesha is worshipped in all the guna forms – satwik, rajasik and tamasik – in the tantras. The satwik worship, which is nishkama, is the highest and is the most difficult one to accomplish. Only one who is fully attained in self-realization is capable of successfully performing it. Sri Ganesha is his Lord Narayana form (of transcendental 'Sri') and is therefore often worshipped along with Goddess Lakshmi, who is the alternate form of Devi Pushti – that is, one who provides all forms of prosperity and nourishment. Lord Ganesha manifests in every sphere of creation and every state of a sadhaka's path of self-realization to provide siddhi or spiritual attainment.

Lord Ganesha is also famous as the scribe for the Mahabharata authored by Krishna Dwaipan (Veda) Vyas. The story of scripting of the epic is well known. Ganesha, who was asked to write down the verses pronounced by Veda Vyasa gave the condition that he will stop writing if Veda Vyas cannot keep up the pace of composition with his speed of writing. This was countered by the sage, who gave the condition that Ganesha can write down what he hears only after assimilating its meaning. Thus the profound magnificent verse was spoken and written. It remains today the one of the greatest classics the world has ever seen. Other than its author Veda Vyasa, Lord Ganesha was the first to assimilate arguably one of the finest yogic treatises ever written. Lord Ganesha is therefore the divine force within every sadhaka that is the first to hear, assimilate and etch the eternal wisdom of shruti into the individual's chitta for constant reflection. We salute this great force-being again and again.

Tailpiece: My laziness in translating the article was clear to Sree Sree Maa. She was

aware that I was waiting for some personal tit-bits about Lord Ganesha to add special flavor to the article. I am aware that she gets bored and tired trying to get things obvious to her into our worldly-matter-filled heads. However, one Sunday evening when I stayed back in the Ashram and got a chance to be with her alone, she had some pity and said the following:

"The temple under construction in our Ashram is built as a chariot of self-realization, the Ratha of Lord Jagannath. It is the preparation of descent of an avatar who will help bring about a transformation which will relieve the world of its enormous suffering, unify faiths and bring about harmony. It is the spiritual symbol of the transformation that is happening in the universe through the will of the Supreme and sadhana of the Mahatmas for the last few centuries. With every stage of the temple construction, the supreme masters directed performance of certain yogic tasks, which you see externally in the forms of the Maha-yagnas, but behind which lies deep sadhana of the unified force of all the benevolent forces of the universe. This can only be viewed in the realm of inner universal consciousness. The first few, namely Dasha-Mahavidya, Shiva-Mahayagna and Narayana- Mahayagna were performed to create the foundation and connect creation with the Great Infinite that lies beyond the realm of Time. These Mahayagnas took place when the temple's inner sanctorum was not set up and only the outer frame was constructed. Subsequently, after the temple's inner part was completed, the Gayatri-Mahayagna was performed to enable truth enlightenment of the Savitri Mandala to manifest and enter. Subsequently the five domes were completed. It was time for enabling siddhi-imparting Lord Ganesha to descend and his Mahayagna was due. But I was taking it easy. One day I saw the image of Lord Ganesha in my inner world. Soon after, our Sri Sri Saroj Baba appeared and told me in an almost scolding tone, 'Two years are gone. Why are you waiting like this? Do what has to be done.' I then got into action. The sages of the Mahatma Mandala provided me with all the inputs and the whole plan was drawn up. What I had planned for a single day turned into a three day affair. New mantras were added to the traditional ones. The first puja was for Bal-Ganesha, the manifestation of Sri Krishna's bala form or the playful child-like creator of the universe – attainment of realization. The next was Maha-Ganesha, which as mentioned was the manifestation of divine Durga-Shakti in its full form – enabling the self-realized one to transform the world and rid it of evil and establish peace. The third was Sri Ganesha, which is the state of transcendental aishwarya – a fully realized one, having conquered all evil in the state of eternal peace and prosperity. This form is different from Siddhi-Vinayaka, who bestows spiritual wealth to an aspiring sadhaka, while Sri Ganesha's form is the expression of power of a fully enlightened being having attained Narayana-hood. With the performance of Ganesha Mahayagna, another part is completed. More will happen when the temple's next stage is complete and for that you will have to wait. Within the next fifty to hundred years a new leela – the outcome of this great sadhana will manifest and hopefully the next Krishna Avatar will appear."

Let us fervently pray for the next successful appearance leela of the Supreme Divine for which so much effort is being made by so many divine soul-beings.

—*by* **Prof. Partha Pratim Chakrabarti,**
her blessed child

Jai Sri Sri Ganesha, Jai Sri Sri Krishna

Biography of Manicklal Dutta

[A disciple of Mahavatar Sri Sri Babaji Maharaj]

(2)

Sri Bhagawan said, "The birth and the activities of an 'Ishwarkoti' (born of divine pedigree) saint is dictated by God Himself."

It has been indicated before that Shyamacharan, the father of Manicklal was blessed by the great saint of Kashidham – Sri Sri Trailanga Swami. Manicklal's father received the divine message from the great yogi, long before Manicklal's birth, that there will be a divine drama of 'Dhanu rashi' (sunsign Sagittarius) in his house. This divine message fructified with the pious birth of Manicklal and in full gratitude towards it, later on, Manicklal mentioned this in his book (known as 'Red Book'), a few lines from which is worth mentioning here:

"It is a most condescending favour in which this great Saint (Trailanga Swami) added this child when grown in grace, would in the voice of one speaking behind, communicate to the regen Srate ones, the first hand experience of God's redeeming grace … His mission would operate with an abiding efficacy, upon his conscience throughout his whole life and would be extensive as would bind in homage, the two undivided hemispheres, into one harmonious concord of righteousness and order."

Shyamacharan was greatly elated with the prophecy of Sri Sri Trailanga maharaj, hence he established it in his heart quietly and to express it to the outer world he engraved a bow sign on a yellow piece of rock and attached it with the chain of the watch, he used daily. Later on, Manicklal used it till his death, as we have seen him. After some time from the divine message, Manicklal took the auspicious birth and later on when the horoscope was analysed, he was found to be of Sagittarius zodiac sign which expressed the prophecy of Sri Trailanga Swami. In this regard, Manicklal uttered :- "The living hope of my birth, as the first child with 'Dhanu Rasi' soon proved to be a certainty, when I was born in the year 1890 and my Rasi Chart was prepared by an expert astrologer, showing all the prospects assigned to me."

Hindu scriptures has two meanings - internal and external. In the practical world, the astrologers have listed the qualities and the negative side of Dhanu Rasi. Internally it indicated a mind completely surrendered to God, which when rises up forms 'Manu' and it is in this purified mind that the immortal words of God reverberate and then it is called 'Dhanu'. In the Dwapara yuga, this Dhanu was carried by the mahabir warrior Partha. Hence Sri Bhagwan said, "Yatro yogeshwar Krishna, yatro Partha Dhanurdhar" (78/18). The meaning of the sloka is eloquently present in the pious and spiritual activities that Manicklal has embarked in his lifetime.

Here are certain excerpts from his own composition that speaks about his birth and works -

"While I took round upon the prodigious resources of a fruitful soil, I find the following points, which are regarded as incontrovertible 'Bible evidence' published in one of the Biglow papers, in 1848, as the wisdom of the poet Lowell's advice and again in 'Beyond the mystic door.' (by Mr. Allon Poole)

1. 'The year 1914' will be the farthest limit of the rule of imperfect man.
2. In that year, "The kingdom of God will be setup" on the earth, on the ruins of present institutions.
3. Christ will be present before that date "as Earth's new Ruler."

4. Before the end of A.D. 1914, the last member of the church of Christ the body of Christ, will be glorified with the Head.
5. From that time, Jerusalem will no longer be trodden under foot, because the 'time of the Gentiles' will be fulfilled.
6. Israil's blindness will begin to pass away.
7. The Great Tribulation will reach its climax in world wide anarchy.
8. Before 1914 God's Kingdom, organised in power, will be in the Earth."

The great, ageless and immortal Kailashbihari Sri Sri Babaji Maharaj who is the kind director of all divine plays whose little introduction has been possible in this write-up was kind enough to initiate Manicklal in the year 1911, by touching his head. From this year itself, Manicklal started his endeavor of analysing and formulating the similarities between 'Bible' of the east and the sutras of the principal Hindu scriptures by the grace of his Guru. I have also tried to introduce several learned and advanced European sadhakas and scholars of those times who met with him unexpectedly and participated in the yagna of knowledge. When the sadhana that Manicklal had accepted as his sole vow, by the grace of his Guru, is reflected, it is clearly understood that Manicklal was the 'Last member of the church of Christ.' The scripture of Bible admits the existence of seven churches in Asia and there were seven saints to theses seven churches. Hindu religion also speaks of the similar orb of the Seven Stars. The last rishi of saint of the congregation of the Seven Stars or the Seven churches is 'Manicklal Dutta' of the ephemeral world. It is our deep belief through perception that the immortal Babaji Maharaj has executed the divine plays, out of the divine wish, for the welfare of mankind.

In the year 1941 on 3rd December, the honorable president Sir Francis Younghusband in the great Parliament of the world Religions in England extended his sincere and painful prayer, "As the institution of religion lies extinct and in its ruins all over, we have to depend on India to excavate the existence of religion. India is the primary pilgrimage of religion. Let India show the beacon of wisdom to the world in this extreme darkness." This great high souled man has mention in the immortal words of Manicklal like "the divine grace that sprouted wisdom in Sir Francis, the light of wisdom that brought forth his renunciation and the sprinkling of spiritual talks for the benefit of the world, is no other than my most worshipful Gurudev, my life – Sri Sri Kailashbihari Babaji. I hereby narrate briefly the reasons for my admiration and respect at His Holy feet. I hope, my elder Gurubrother, Thakur Sri Shyamacharan Lahiri Mahasay will be contented with this narration and will join with me astrally."

...to be continued

—Sri Ardhendu Sekhar Chattopadhyay

Translated into English
by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Forthcoming Events

Janmastami: 15th August, Tuesday
Spiritual Congregation: 17th September, Sunday at 7 p.m
Mahalaya: 20th September, Wednesday
Navaratri Durga Puja: 21st to 30th September
25th Sept (Panchami): Evening Programme
27th Sept (Saptami): Evening Programme
28th Sept (Ashtami) : Food distribution in the afternoon on the occasion of Lahiri Mahasaya's death anniversary.
29th Sept (Navami) : Mahaprasad of Sree Durga Devi will be distributed in the afternoon.
Kojagari Laxmi Puja: 5th October, Thursday

The Philosophy of Truth

The Proof of Unreality of the World

Chapter 10

Mahatma continues:

You experience the objects of the world with the five senses – eyes, ears, nose, tongue and skin. But this experience is fallacious as it has eight obstacles – 1. Distance of the object, 2. Proximity to the object, 3. Bewilderment, 4. Limitation of the senses, 5. Similarity of appearance, 6. Subtleness, 7. Distance from another object, 8. Mental non-reception

1. The sun appears small compared to the earth like a circular disk and the stars appear like small dots. As these celestial bodies are situated far off, they appear so because of the distance. This is distance of the object.
2. As the pupil of the eyes and the eyelids are very close to the eyes, they are not visible. This is proximity to the object.
3. Though the stars are present in sky at daytime, they are not visible due to the radiance of the sun. This is called Bewilderment.
4. A blind or a deaf person cannot see or hear inspite of the presence of his eyes or ear because of sense defect or loss. This is limitation of the senses.
5. If a handful of mustard seed is thrown into a big heap of mustard seeds, then the handful of mustard seeds cannot be retrieved back. Due to similarity of appearance the handful of mustard seeds cannot be discriminated.
6. Because of its extreme fineness, the atoms are not visible in naked eyes. This is the property of subtleness.
7. Imagine someone is singing sweet songs five miles away from you. But it is not audible to you owing to the distance of the person singing.
8. When the mind is deeply engrossed in some thoughts, it does not register any happenings in front of it. This is due to mental non-reception.

Normally these are the eight types of error that baffles our experience. These obstacles can be overcome only by sharp judgement. But the false objects that seems to be real because of ignorance ultimately manifests as false when its true nature express itself. Hence falsehood cannot express itself as truth and vice-versa. My son! Dream is the best example of a false incident which appears as real. As dream of a tiger brings fright, shivering and break of sleep, similarly unreal objects can project itself as true. Your mind is Brahman, hence it is not constituted by the five bhutas, but it had lead to the imaginary existence of the five bhutas. The mind, drishya and drasta are identical. Hence the imagination of your mind terrifies you like the ghost, born of a child's imagination, to the child. Hence try to understood the meanings of 'truth' and 'falsehood', then you can follow everything.

Bhakta: My Lord! Normally we understand anything that does not exist as false and anything that exists as truth.

Mahatma: How could you address something which does not exist as real or unreal? For example, when you mistake a rope for snake, then whether the snake is real or unreal is a matter of judgment. When nothing is visible, what is to be taken as true or false?

...to be continued

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

My Life With Anirvan
Part - XXXII

Anirvanji wrote to me this letter after receiving my letter

Om Haimavati, Shillong
12.9.64

My dear Gautam,

Your letter of the 4th giving a detailed account of your pilgrimage reached me here on the 7th. While reading it, scenes rose before the mind's eye and seemed to transport me to the very places where you were. The whole adventure was a concentrated tapasya on your part, a lever to raise your consciousness to a higher level. It does not matter if you had not seen or heard anything specific. That would have bound you and not left you as a free agent of the Lord. What you have achieved is a change of consciousness and that is the right thing. If you can maintain the height you have reached, you will have done what was expected of you. The rest will follow in due course.

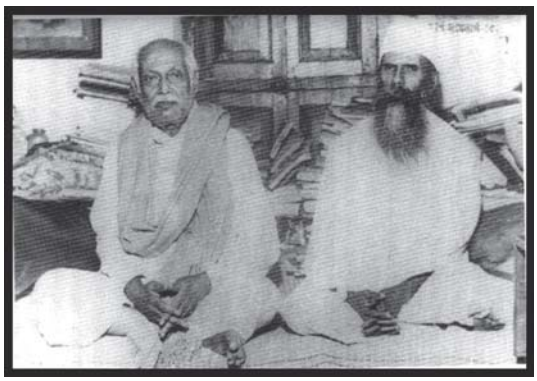

Sri Anirvan with Sri Gopinath Kaviraj

In his last letter this week Shri Chatterjee says that the anonymous friend hopes to lay the foundation of the new Haimavati in ten or twelve days and as it is a simple structure, the whole will be finished by the middle of December[1]. I had sent him a plan of three rooms – one bedroom, one guest room and one study room with a verandah in front of it. The whole thing appears to me to be a mystery. Well, let Her will be done. Perhaps I shall have to go to Allahabad from Calcutta, if my friend lives through these months. He is now in a precarious condition. Anyhow, I want to begin work by the middle of December. I had written to Bina[2] about the new turn of things and she approves of it.

I am glad that Narayani has almost finished her work on the Aitereya. Haimavati willing, I hope to do many things with her. Give her my love and congratulations.

Here on Saturdays, I am working with Sandhya on the Kena Upanishad. I have hit upon a new plan. At a sitting, I revise the notes and slowly dictate to her and the result is an almost finished product which will require very little further revision and it is also quicker than if I would have written the whole thing by myself. I do not know how far we shall be able to go in Kena before I leave. Anyhow, I shall apply the same method to Katha, Prasna and Mundaka. With the help of Narayani and when I have dictated, she will collate and edit the whole thing.

I hope this will reach you before Sharad leaves. Give him a bagful of special good wishes from me… And love to you all – a special quota for the little darling Swagata –

Ever yours – A.

[1] In fact only the plinth of the house was laid and the whole of Haimavati was ready for occupation by the end of April 1965. Sri Anirvan came over to stay at Narendrapur Haimavati on 2nd May 1965. From 19th November 1964 to 1st May 1965, Anirvanji stayed at GH Keyatala Road.

I have two more letters of Sri Airvan during September 1964. There might be one or two more letters during October, but I do not find them in my file. Perhaps they might be postcards. Anyway on both sides, we are all getting ready for the arrival of Sri Anirvan at Calcutta. Haimavati at Narendrapur is under construction. Anirvanji is busy with the second volume of Veda Mimamsa.

Sharad goes on his short business tour and returns by the middle of October. We decide that Jyoti and Munni (Madhavi – Anirvanji's Swagata) also will go to Shillong to bring Anirvanji to Calcutta! Binadi[2] too decides to go to Shillong along with Sharad and Jyoti. We are all so excited!

Om Haimavati, Shillong
19.9.64

My dear Gautam,

Your letter of the 19th. Usha came to me yesterday. I have got the books and locula. Thanks you. Bari will come on Sunday.

I am working hard, but rhythmically. I do not feel the strain. I do not work at all when I am not in a mood for it. I think, I shall not be able to finish the second volume before I go down. Perhaps about fifty pages will remain to be written. And even then the chapter on the Gods will not be completed. The book is growing. Well, let it grow. I do not care even if it is not finished.

Swagata reminds me of Ahana[3]. She also was a yogini – a wonderful child for the first few years. Flowers are always beautiful, even if the fruits are not so. Let us be happy with what we have. Perhaps it is a law that the first appearance is always a full manifestation of the Divine. Then gradually the glory recedes. Let us hope in Swagata's case, the fruit also will be as sweet as flower. Hope is God!

Don't worry about Bablu. If he us upright and honest, that is enough. Idealism will come to him later on. Children generally take not after the father but after the grandfather. There is always a gap between the generations. I have noticed it in many cases. Let everyone follow his own Dharma.

How is Kiki? Working hard? Tell her, I often remember her. She must make good her promise to me.

With love for you all,

Ever yours — A

PS: Perhaps Sharad has left?

In my next letter to Sri Anirvan, I gave Anirvanji all the details about the construction of the new building for Haimavati at Narendrapur, at village Elachi under Narendrapur P.O. Thus came the next letter.

Om Haimavati, Shillong
26.9.64

My dear Gautam,

Your letter of the 18th . You must have got my letter of the last week. I got all the things all right. Thank you.

[2] It was Bina Das who was trying for the Hridaypur sight! But Binadi also knew the new arrangement at Narendrapur. I too! But we all kept a secret before Anirvanji comes down to Calcutta!

[3] Ahana – daughter of Sri S. B. Roy whom Anirvanji saw almost from her birth. He kept a small photo of Ahana in a meditative posture, near his writing table. The name was given by him. It means DAWN.

So Haimavati wishes to convert Hridaypur to Narendrapur! Well and good. Let Her will be done! Strange enough among my friends of childhood, I am still known as Naren[4]. What a coincidence!

My friend[5] at Allahabad is seriously ill. I am expecting the last news any moment. If by a miracle he lives on, I shall have to go to Allahabad after reaching Calcutta. If not, I shall go nowhere and after resting a week, begin my work at Calcutta, the second volume of Veda Mimamsa has to be finished as soon as possible. The book is growing. It will keep me occupied for the coming five years. I think I shall begin the work at Keyatala and Shift to Narendrapur when everything is ready. No hurry.

I have only five or six Saturdays before I leave. Kenopanishad will not be finished, I am afraid. It can be done in Calcutta. As I am dictating the whole thing after consulting the notes, it can be taken down by anybody. Just as the notes are taken down from the tape record. So I am not going to suggest anything to Sandhya. I don't want to meddle in her affairs and I never did. I feel she is not free now as she was. Though I have an open mind; I don't think a marriage between spirituality and communism is still possible. It is her duty to follow the path of the man of her choice. My intrusion may bring in discordant note. When a man possesses a woman, he naturally wants to have her whole. Divided loyalty is no good. So, I shall be the last person to cross her path.

I shall remain a cave man even in Narendrapur as here in Shillong. So, I don't think, I shall have to sacrifice my loneliness. If a strict routine is followed, I can give my friends, plenty of company by retaining my loneliness. The Five year plan has to be implemented. But she knows.

I think Sharad has left. Give him my best wishes of Super brand when you write to him. A wireless and silent communication to little Swagata. To you all, buskets of love and good will.

Ever yours – A

The month of October passed very quickly. Sharad, Jyoti, Little Madhavi and Binadi left for Shillong on 29th October. Sharad with the help of Prof. Panigrahi arranged for packing of the huge library of Anirvanji and despatched them to Calcutta by lorry. They packed most necessary books for immediate work in three big steel trunks and brought them by passenger parcel along with their luggage.

The whole party headed by Anirvanji left Shillong on 15th November, took the train from Guwahati on 17th November and arrived at Calcutta on 19th November.

Anirvanji took complete rest for about four days and began his usual work from 24th November. We had temporarily arranged for his stay in the big room of Sharad and Jyoti on the backside of our Keyatala Road house.

– Sri Gautam Dharmapal

[4] Swami Vivekananda's boyhood name was Narendranath. Sri Ramakrisha called him "Loren" - from Noren! Was the area given the Narendrapur from the student time name of Swami Vivekananda?

Naren: Anirvanji's name in his young age was Narendra Chandra Dhar. Her father's name was Raj Chandra Dhar – sanyas name – Swami Swarupananda. Narendra was shortly called Naren like his friends Birendra – Biren and Dhirendra – Dhiren!

[5] Dhirendra Chandra Dasgupta. He passed away in the 1st week of October 1964.

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(23)

Spiritual Advice Towards a Disciple

(...Continuing)

The Shruti says,

"Janma-bandha-vinirmuktah
Padam gacchanty anamayam".

Meaning: The spiritual seeker liberates himself from the bondage of life and death and attains a state beyond all miseries. The word '*Amay*' refers to bondage and suffering; '*Anamay*' is its opposite and denotes a state beyond all miseries.

Just as physical illness is cured through medicines and prescribed dietary supplements, meditative penance delivers liberation from material-attachment driven miseries of a Self-knowledge ignorant individual. Enlightenment and subsequent liberation follows as a natural consequence of meditative penance and is assured to happen without fail. The Bhagwat Gita says,

"*Abhito brahma-nirvanam*
vartate viditatmanam".

Meaning: Realization of the divine principles of Self-knowledge bestows *Brahma-nirvan* on the spiritual seeker both during his life as well as after-life. It is not that *Kaivalya* or *Brahma-nirvan* is only achieved after death, it may be attained even during life, before the mortal coil is released.

The devotees of God dedicate their all towards His service. They do not relinquish the service unto His lotus feet even for the lordship of the three worlds or liberation. Thus the Srimad Bhagwat says,

"*Diyamanang na grinhati*
vinamat-sevanang janah."

Even if offered, he abandons salvation for the service of the Lord. This is how scriptures characterize the nature of a devotee. However, such devotional service definitively leads to enlightenment and salvation. It is true that God cherishes service and devotion. However, He never desires the delay of His devotee's liberation in order to seek devotional service from the devotee. God is the bestower of the fruits for all committed actions – and this includes actions associated to meditative penance. This aspect of God defines His absolute code of conduct. His devotee is assured to be liberated through divine enlightenment either during life or subsequent to the release of his mortal coil.

It is incorrect to assume that devotion towards God will cease to exist if liberation is attained during life. Many liberated saints such as *Sanaka*, *Sananda*, *sanatan* and *Sanatkumar* are renowned for their ardent and exemplary devotion towards God. They are considered to be among the principal preceptors in the path of *bhakti* or devotion. The true advisors on the essential principles in the path of devotion are the liberated saints.

The devotees proclaim, "Liberation is the servant of devotion." This is because, selfless surrender at the Lord's lotus feet naturally ushers in deliverance. Worship and penance in the yogic path of devotion inevitably leads to the revelation of divine knowledge as well as salvation. Both knowledge and devotion has been emphasized and praised in almost all chapters of the *Bhagvad Gita*. The importance of both these meditative streams has been acknowledged by spiritual scriptures. If ideas of the paths of knowledge and devotion were mutually conflicting, the scriptures would praise only one of them and not both. Many aspirants of the path of devotion consider knowledge to be deterrent to their practice and success. Similarly, many practitioners of the knowledge-driven yogic path falsely assume devotion as a

hindrance in their path. However in reality, knowledge and devotion are not mutually contradictory to one another. The followers of the path of non-dualism[1] (*Adwaita*) do acknowledge the significance and role of the principles of dualism[2] (*dwaita*) in the course of their yogic practice. The practice of meditative-penance according to advice either received directly from the Guru's mouth or through spiritual texts, may all be considered to be part of the principles of dualism as outlined in the spiritual scriptures. It is not also the case that all practitioners of the non-dualistic path are adverse to the idea of the worship of God. Even they are seen to accept and adapt the ideas of the dualistic path of devotion as supportive components in their path and practice of non-dualism. Similarly, many aspirants of the path of devotion are seen to apply the principles of non-dualism. Following the advice of the divine scriptures, they pray and worship God as the one and same essential inner being (*atman*) within all embodiments in this creation.

—*Her blessed child,* **Sri Arnab Sarkar**

1. Non-dualism: The yogic stream of thought and practice founded on the principle of the absolute oneness and dissolution of individualistic consciousness in the Universal consciousness.

2. Dualism: The yogic stream of thought and practice founded on the principle of the essential distinction between the Supreme Universal God-head (*Bhagwan*) and individualistic soul (*Bhakta*).

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(37)

I narrate one more astonishing incident that I have heard from Ashishda (Ashish Banerjee), that speaks of Sri Sri Baba's spiritual power. Ashishda said, "Suddenly our dada (Sri Sri Baba) fostered a desire to go to New Delhi for some special reason. Dada was to leave on an evening probably by Poorva express. As the date approached, I said Dada, 'I shall come out from the office a little early and accompany you to the station.' But Dada didn't agree to it inspite of repeated requests. On the specific day, I came out from office early and reached Howrah station at time inspite of Dada's disapproval. During those days, Dada had a temporary habit of having 'khaini';. When this thought came to my mind, I bought a good container and filled it with khaini and limestone. The train stood at the platform but Dada's name and berth number was not seen in the attached reservation list. The gentleman who was accompanying him, neither had his name and seat number on the list. Finally I came home with lot of despair and hurt self-respect. When Dada came back, I went to visit him the next day. As he saw me, he said with immense enthusiasm, 'Ashish, give me the khaini. I felt great eagerness in having it.' I became overwhelmed with joy and sat at his feet.

(38)

One day, small bhetki fish curry was being prepared in our house (Ashish Banerjee). Suddenly I remembered that small bhetki fish curry was Dada's favourite. Hence I took the above curry inside a tiffin box, took it to Dada's (Sri Sri Baba's) house and kept it with Boudi in the kitchen at first floor. When Dada sat for his lunch, as usual, in the afternoon, he refused to take the fish preparation made by Boudi, inspite of Boudi's repeated requests. Then he spoke out, 'Please give me the bhetki fish preparation brought by Ashish.' Then he had it happily. This proves the love of God towards His devotee.

(39)

Guru Maharaj relieved the drummer of his debt: Durgapuja was celebrated in Sir Sri Baba's house like it is celebrated in our ashram (Akhanda Mahapeeth). On one such

Durgapuja occasion, Dada sent Rs. 100 in advance through Angshuman to book a drummer, a few days prior to puja. This drummer used to live somewhere in Domjur or Bargachia and used to come everytime in Durgapuja to beat the drum. Suddenly after one or two days, Dada sent Angshuman to the drummer to bring that Rs. 100 back from him. Angshuman could not understand the rhyme or reason of his action, so he went to the drummer according to Dada's order and brought the advanced money back. In the meantime, an incident happened. People from Udaynarayan junction, Bargachia, Domjur and Makardaha needed to cross the Dasnagar railway station in order to come to Howrah. The vehicles had to pass under the overbridge at Dasnagar railway station. In those areas in overcrowded buses, people sit in the roof of the buses for travelling. Accidentally if anybody stands on the roof of the bus, his head would bang with the under portion of the rail bridge and death was inevitable. Similar incidents used to occur sometimes even on repeated warning. Our drummer was coming to Howrah for some reason and he confronted a similar accident and died two days prior to the Durgapuja. Our Dada came to know of this misfortune beforehanded and thus he released the drummer from his debt of Rs. 100 in this birth. (Ashishda was present during this incident.) *...to be continued*

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

News in Brief

15th April - On the occasion of the Bengali new year, a lot of devotees visited the Ashram. Sree Sree Maa gave discourse on Kriya Yoga to the devotees. The previous issue of Hiranyagarbha was released.

16th April – Renowned actor and singer Sri Arindam Ganguly visited the Ashram in the evening and sang a collection of enchanting melodies in the presence of Sree Sree Maa.

28th April - On this auspicious day of "Akshay Tritiya" which also marks the enthronement ceremony of the idol of Sri Sri Gajanan at the Ashram, the worship of Sri Sri Gajanan was performed at "Sree Annapurna Kshetra".

10th May - On the occasion of Buddha Purnima and Sri Sri Babaji Maharaj's statue installation anniversary, bhog was offered in the Ashram. In the evening, Sree Sree Maa gave a short and profound discourse on Kriya Yoga. Like every year the spiritual question-answer session was conducted by our guru-brother Dr. Barun Dutta.

1st June - 20th June - The ashramites got a chance to serve the renowned saint Sri Sri Tatbaba of Pushkar, who stayed at the Ashram during these days.

9th June - Celebrating the birth anniversary of the earthly sojourn of Sree Sree Maa, Sri Sri Guru puja was conducted in the morning at Sree Sree Annapurna Kshetra. In the afternoon, devotees received prasad. Bhajans were presented by our Guru-brothers and sisters in the evening. Following this, Sree Sree Maa presented a few beautiful stavas and bhajans which mesmerized the audience.

25th June - On this day, the 23rd session of the 'Adhyatmik Sabha' was organised at the Ashram premises. In this session, our Guru-brother Dr. Barun Dutta presented a discourse on the Kathopanishad.

Subscription for Hiranyagarbha

Hiranyagarbha is a quarterly journal. The subscription fee for the journal in case of hand collection is **Rs. 80.00** and for postal delivery is **Rs. 100.00** per year (within India). Subscription forms may be obtained at the Ashram premises or by emailing to akhanda.mahapeeth@gmail.com. For information and help, contact Sri Arnab Sarkar (Mob. 094748-96776), Smt. Keya Chakraborty (Mob. 094324-56831), Sri Mohit Shukla (Mob. 094321-70365); Website : www.akhanda-mahapeeth.org.

হিরণ্যগর্ভের গ্রাহক হবার জন্য অথবা গ্রাহকত্ব পুণর্নবিকরণের জন্য
নিম্নের ফর্মটি পূরণ করে আশ্রমের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

Form No. .....

Akhanda Mahapeeth
Mata Sharbani Trust

Hiranyagarbha Subscription Form/Renewal Form

1. Subscription in Favour of (Name) : .....
2. Address : .....

.....

.....

3. Phone No. 1..... 2..... Email : .....
4. Period of Subscription : ☐ 1 year / ☐ 2 years / ☐ 3 years.

   From (Date) : ..... To (Date) : .....
5. Delivery Mode : ☐ Hand Collection / ☐ Postal Delivery.
6. Payment Mode : ☐ Cheque / ☐ Cash. Amount in Rs. .....

.....

Details of Cheque (drawn in favour of "Mata Sharbani Trust").....

.....

7. Checked by (Name) : .....

Signature :.....Date :.....